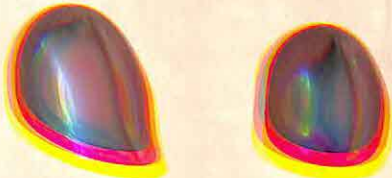
প্রকাশক :
শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

মূল্য—১৶০

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

সূচীপত্র



প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন মানবে মোরা জানিব কেমনে—

"কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও ?
কথা কও, কথা কও।"

আমরা সেই অতীতের কথা শুনিতে চাই। কিরূপে মানুষের সৃষ্টি হইল, তাহাদের আদিম জীবন কিরূপ ছিল, কিরূপেই বা বিঘ্নবিপদ জয় করিয়া তাহারা সভ্য হইয়া উঠিল,—এই সব বিচিত্র কথা আমরা জানিতে চাই। কিন্তু জানিব বলিলেই কি জানা যায় ? জানিবার সুযোগও থাকা চাই। যে সময় হইতে আমাদের কথা আরম্ভ করিতে হইবে তখন এই পৃথিবীতে না ছিল ছায়াছবি, না ছিল বই, না ছিল খবরের কাগজ। তবে কি সে যুগের কথা জানিবার কোন উপায় নাই ? আছে বৈ কি ! পণ্ডিতেরা আমাদের জন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকে বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বহু প্রাচীন পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাইয়াছেন। সাপ, বাঘের ভয় না রাখিয়া তাঁহারা দুর্গম পাহাড়ে ও গুহায় গিয়াছেন। তাঁহারা অনেক গুহার দেওয়ালে আঁকা দেখিয়াছেন বিরাট জানোয়ার ও তাহাদের শিকারের ছবি। তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন নানা রকমের পাত্র, আর নানা রকমের অলঙ্কার। তাঁহারা মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন অজানা শহরের চিহ্ন। ঐ সব শহরে তাঁহারা দেখিয়াছেন সমাধি ভূমি, মন্দির আর নানা রকমের ঘর-বাড়ি। এই সব অস্ত্র, ছবি, পাত্র, অলঙ্কার, ঘরবাড়ি, সমাধি ও মন্দির হইতে

ed by the Board of Secondary Education, West Bengal,
a Text Book for Class VI of Secondary Schools. Vide
Notification No. Syl/69/54 dated 8. 12. 54.

পৃথিবীর ইতিহাস

[প্রাচীন যুগ]

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী
সেণ্ট পল্‌স্ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং
বরিশাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ

১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন মানবে মোরা জানিব কেমনে—

"কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও ?
কথা কও, কথা কও।"

আমরা সেই অতীতের কথা শুনিতে চাই। কিরূপে মানুষের সৃষ্টি হইল, তাহাদের আদিম জীবন কিরূপ ছিল, কিরূপেই বা বিঘ্নবিপদ জয় করিয়া তাহারা সভ্য হইয়া উঠিল,—এই সব বিচিত্র কথা আমরা জানিতে চাই। কিন্তু জানিব বলিলেই কি জানা যায় ? জানিবার সুযোগও থাকা চাই। যে সময় হইতে আমাদের কথা আরম্ভ করিতে হইবে তখন এই পৃথিবীতে না ছিল ছায়াছবি, না ছিল বই, না ছিল খবরের কাগজ। তবে কি সে যুগের কথা জানিবার কোন উপায় নাই ? আছে বৈ কি ! পণ্ডিতেরা আমাদের জন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকে বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বহু প্রাচীন পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাইয়াছেন। সাপ, বাঘের ভয় না রাখিয়া তাঁহারা দুর্গম পাহাড়ে ও গুহায় গিয়াছেন। তাঁহারা অনেক গুহার দেওয়ালে আঁকা দেখিয়াছেন বিরাট জানোয়ার ও তাহাদের শিকারের ছবি। তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন নানা রকমের পাত্র, আর নানা রকমের অলঙ্কার। তাঁহারা মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন অজানা শহরের চিহ্ন। ঐ সব শহরে তাঁহারা দেখিয়াছেন সমাধি ভূমি, মন্দির আর নানা রকমের ঘর-বাড়ি। এই সব অস্ত্র, ছবি, পাত্র, অলঙ্কার, ঘরবাড়ি, সমাধি ও মন্দির হইতে

আমরা অতি প্রাচীন যুগের অনেক কথা জানিতে পারি ; কিন্তু সব কথা জানিতে পারি—এমন কথা বলিতে পারি না। আমাদের জানার মধ্যে এখনও অনেক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে।

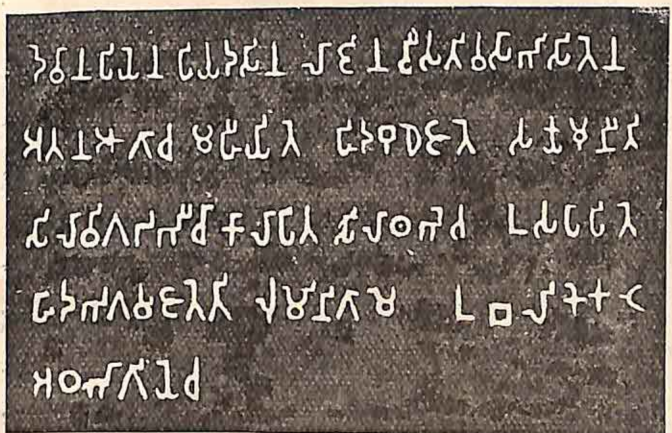
একটু কম প্রাচীন যুগের কথা আমরা বেশি করিয়া জানিতে পারি। এই সব যুগে ব্যবহার করা অনেক জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে। কবে ঐগুলি তৈয়ারি হইয়াছিল, পণ্ডিতেরা সে কথা মোটামুটি ভাবে বলিতে পারেন।

প্রাচীন যুগের কথা জানিবার আরও তিনটি উপায় আছে। ইহারা হইল শিলালিপি, মুদ্রা আর বই। পুরান পাথরের দেওয়ালে, স্তম্ভের উপরে আর মন্দিরের গায়ে অনেকগুলি প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। পাথর বা শিলার উপরে লিখিত বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় **শিলালিপি**।

কেন এই সব শিলালিপি লেখা হইত—তোমরা নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন করিবে। ইহার অনেক কারণ ছিল। আমরা দুইটি কারণ দিতেছি। প্রথম কারণটি হইল—আপনাকে স্মরণীয় করিবার ইচ্ছা। ধর, কোনও রাজা যুদ্ধ জয় করিলেন, বা কেহ একটি মন্দির তৈয়ারি করাইলেন ; তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হইতে পারে লোকে যেন তাঁহাদের কাজ চিরকাল মনে রাখে। এই উদ্দেশ্যে রাজা তাঁহার জয়ের কথা পাহাড়ের গায়ে অথবা পাথরের গায়ে লিখিয়া রাখিতেন। যিনি মন্দির তৈয়ারি করাইতেন তিনি মন্দিরের গায়ে আপনার নাম লিখিয়া রাখিতেন।

দ্বিতীয় কারণটি হইল লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা। আমাদের দেশে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। কিসে লোকের কল্যাণ হইবে ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড়ে, স্তম্ভের গায়ে ধর্মের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিখিয়া দেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,

সকলে পথে যাইতে যাইতে সহজে এই সব উপদেশ দেখিতে পাইবে এবং ভাল হইবার উৎসাহ লাভ করিবে। শিলালিপিতে অনেক সময় রাজারা তাঁহাদের বংশ পরিচয়, রাজ্যসীমা এবং কার্যাবলীরও বিবরণ দিতেন। এইসব বিবরণ হইতে আমরা তাঁহাদের যুগের অনেক কথা জানিতে পারি।



অশোকের শিলালিপি

এই সব প্রাচীন লিপি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত। ঐ সব ভাষা আবার আমাদের যুগের ভাষা হইতে পৃথক। পণ্ডিতেরা ইহাদের অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব ভাষা শিখিতে পারেন নাই। কতকগুলি প্রাচীন লিপির ভাষা এখনও আমাদের অজানা রহিয়াছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, প্রাচীন যুগের কথা জানিবার একটি উপায় হইল **মুদ্রা**। মুদ্রা কাহাকে বলে জান? তোমরা টাকা, পয়সা,

সিকি, দুআনি নিশ্চয়ই চেন। ইহাদের সাধারণ নাম মুদ্রা। প্রাচীন যুগের রাজারা মুদ্রা তৈয়ার করাইবার সময় তাঁহাদের নাম ও রাজত্বকাল উহাদের উপরে ক্ষোদিত করাইতেন। অনেক সময় তাঁহারা ঐ মুদ্রায় তাঁহাদের প্রিয় বিষয়ের এবং ধর্ম প্রভৃতিরও উল্লেখ করিতেন।



গ্রীকমুদ্রা

প্রাচীন যুগের কথা আমরা বিশেষ করিয়া জানিতে পারি **বইয়ের** সাহায্যে। এই বই লেখা হইত তাল পাতায়, মাটির ফলকে বা চামড়ার উপরে। মিশরে 'প্যাপাইরাস' নামে একপ্রকার উদ্ভিদ জন্মে। মিশরীরা ঐ উদ্ভিদের সাহায্যে কাগজের মত লিখিবার উপকরণ তৈয়ারি করিয়া উহার উপরে বই লিখিত। প্রাচীন যুগের লিখিত বই পড়িয়া আমরা ঐ যুগের আচারব্যবহার ও আদর্শ প্রভৃতির পরিচয় পাই। আমাদের প্রাচীন বই হইতেছে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার ছবি দেখিতে পাই।



প্যাপাইরাস

শিলালিপি, মুদ্রা এবং বইয়ের সাহায্যে আমরা প্রাচীন যুগের অনেক কথা জানিতে পারি। কিন্তু সব কথা জানিতে পারি না। তবে পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকেরা যাহা জানিত আমরা তাহা হইতে বেশি জানি। বহু সুশিক্ষিত সন্ধানীর সাধনার ফলে আমাদের

এই জ্ঞানের সীমা বাড়িয়া চলিতেছে। আশা করি, তোমরাও হয়ত একদিন স্তূপ খুঁড়িয়া মাটির নীচ হইতে আমাদের অতীত ইতিহাসের অনেক আজানা চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিবে ; আর কামনা করি—তোমাদের সেই অনাগত যাত্রাপথ সুগম হউক।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কি উপায়ে আমরা অতি প্রাচীন যুগের কথা জানিতে পারি ?

২। 'একটু কম প্রাচীন যুগের কথা আমরা বেশি জানিতে পারি'—এরূপ মনে করিবার কারণ কি ?

৩। শিলালিপি কাহাকে বলে ? কেন শিলালিপি লিখিত হইত ?

৪। মুদ্রা কাহাকে বলে ? মুদ্রার সাহায্যে কিরূপে আমরা প্রাচীন যুগের কথা জানিতে পারি ?

৫। প্রাচীন যুগে কোন্ কোন্ উপকরণের উপর বই লেখা হইত ?

৬। আমরা কি প্রাচীন যুগের সব কথা জানিতে পারি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

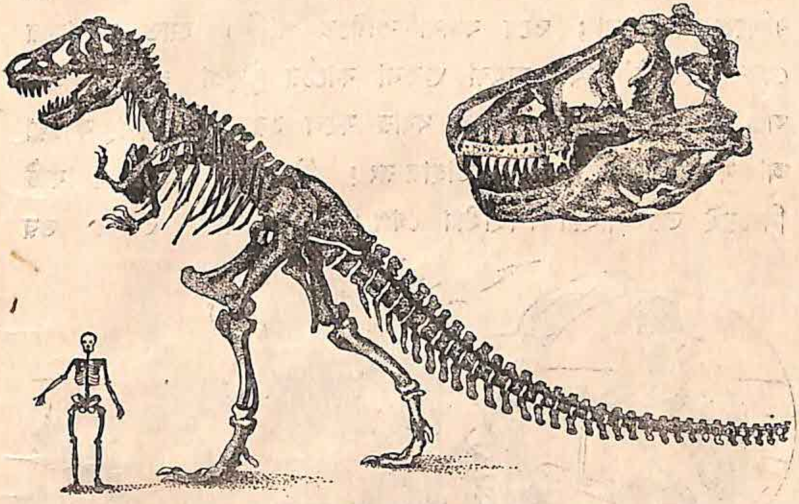
মানবের আদিম জীবন ও তাহাদের নানাবিধ জাতি সংগঠন—

"মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।"

এখন আমরা সুসভ্য হইয়াছি। জ্ঞানে, ধর্মে, কর্মে আমরা বড় হইয়াছি। মনে রাখিতে হইবে, বহু পরিবর্তনের পরে, বহু যুগের সাধনার ফলে, আমরা এই সভ্যতা লাভ করিয়াছি। এমন দিন ছিল, যখন পৃথিবীতে সভ্যতার চিহ্নমাত্র ছিল না; মানুষ ছিল না, কোন প্রাণী ছিল না, এমন কি জল, মাটি পর্যন্ত ছিল না। তখন পৃথিবী ছিল আগুনের অপেক্ষাও হাজার হাজার গুণ গরম।

ধীরে ধীরে পৃথিবী শীতল হইল। তখন জল হইল, মাটি হইল, মাটিতে ঘাস হইল, গাছ হইল, গাছে ফুল হইল, ফল হইল। আরও অনেক পরে পৃথিবীতে জীবজন্তুর জন্ম হইল। আদিম যুগের অনেক জন্তুই ছিল এত বড় ও এত ভয়ঙ্কর যে তোমরা তাহা ভাবিতেও পার না। ইহারা বহু যুগ আগে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা

ইহাদের অনেক কঙ্কাল খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং সংগ্রহালয়ে (মিউজিয়ামে) রাখিয়া দিয়াছেন।



আদিম অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল

প্রথম অবস্থায় মানুষের সহিত পশুর কোনও প্রভেদ ছিল না। তাহারা ছিল বানরের আত্মীয়। পশুর মতই তাহারা জীবনযাপন করিত। অনেক যুগ পর্যন্ত তাহারা গাছের কোটরে কিংবা পাহাড়ের গুহায় বাস করিত। কাঁচা মাছ, মাংস আর ফলমূল খাইয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিত। মানুষের কিন্তু বরাবরই একটি গুণ ছিল— সেইটি হইল তাহাদের বুদ্ধি। এই বুদ্ধিবলেই তাহারা সকল জীবজন্তু, এমন কি জল, বায়ু, আগুন প্রভৃতির উপরও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।



আদিম মানব

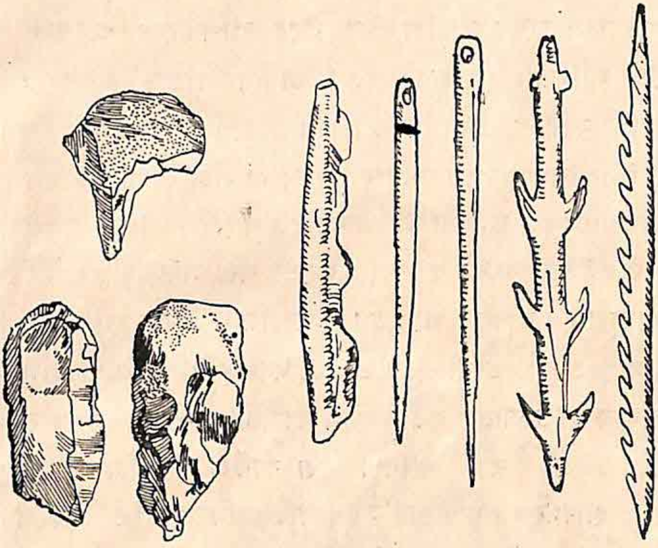
মানুষের প্রথম জয় হইল, যখন তাহারা আগুনকে কাজে লাগাইতে শিখিল। কেমন করিয়া তাহাদের এই শিক্ষা হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে কল্পনা করিতে পারি। হয়ত তাহাদের কেহ দুইখানি পাথর অথবা শুকনা কাঠের টুক্‌রা হাতে লইয়া অন্য মনে ঘষিতেছিল। এই ঘষার ফলে হয়ত হঠাৎ দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কি তাহার রং! কি তাহার তেজ! লোকটি নিশ্চয়ই ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল। কিন্তু ক্রমে তাহার ভয়



আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার

কাটিয়া গেল। বুদ্ধি বলে সে আগুন জ্বালিবার কৌশলটি ধরিয়া ফেলিল। তাহার অভিজ্ঞতার কথা ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মানুষ আগুনকে কাজে লাগাইতে শিখিল। ফলে তাহাদের আর কাঁচা মাছ-মাংস খাইয়া থাকিতে হইল না। তাহারা রান্না করিতে শিখিল।

পাথরের সাহায্যে তাহারা অস্ত্র তৈয়ারি করিতে শিখিল। কালক্রমে তাহারা ঐ সকল অস্ত্র ধারাল ও পালিশ করিয়া তুলিল। উহাদের সাহায্যে তাহারা গাছ কাটিয়া ঘর তৈয়ারি করিতে আরম্ভ



প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র

করিল। বন্য জন্তুর আক্রমণ এড়াইবার জন্য অনেক সময় তাহারা হ্রদের উপরে ঘর তৈয়ারি করিত।



হ্রদের উপর বাড়ি

অন্যান্য বিষয়েও তাহারা ধীরে ধীরে আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে লাগিল। তাহারা পশুর চামড়া পরিতে আরম্ভ করিল। পশুপালন করিতে, এমন কি জমি চাষ করিতেও তাহারা শিখিল।

এই সব শিক্ষার ফলে তাহাদের জীবনের ধারা বদলাইয়া গেল। পূর্বে পশুশিকার অথবা ফল সংগ্রহ না করিতে পারিলে তাহাদিগকে উপবাসী থাকিতে হইত। এখন তাহারা ক্ষেতের শস্য অথবা গরু প্রভৃতির দুধ খাইয়া ক্ষুধা দূর করিতে পারিত। প্রয়োজন হইলে তাহারা পালিত পশুর মাংসও খাইতে পারিত। তাহারা কাপড় পরিতেও আরম্ভ করিল।

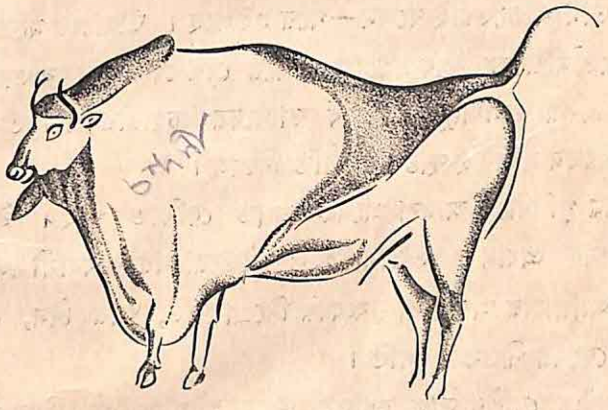
চাষ করিতে আরম্ভ করার ফলে তাহাদিগকে ক্ষেতের কাছে বাস করিতে হইত। শত্রু আসিয়া শস্য কাটিয়া না লইয়া যাইতে পারে, এজন্য তাহাদিগকে পরস্পরের কাছাকাছি থাকিতে হইত। ফলে একই জায়গায় অনেকগুলি ঘরবাড়ি তৈয়ার হইতে লাগিল। বহু পরিবার কাছাকাছি বাস করার ফলে গ্রাম গড়িয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে একযোগে কাজ করিবার অভ্যাস বাড়িতে লাগিল। এইরূপে গ্রাম্য জীবনের সূচনা হইল।

রান্না করিতে ও শস্য সঞ্চয় করিতে পাত্রের প্রয়োজন। তাই মাটি দিয়া তাহারা নানা রকম পাত্র তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে ক্রমে তাহারা সোণা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করিল। তামা ও টিন মিশাইয়া তাহারা ব্রোঞ্জ তৈয়ারি করিল। ইহার পর তাহারা লোহার ব্যবহার শিখিল।

মানুষ মনেরও উন্নতি করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কথা বলিতে শিখিল। প্রথমে তাহারা অল্প কয়েকটি শব্দের সাহায্যে তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিত। ক্রমে ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানের লোক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করিত। ফলে বিভিন্ন ভাষার জন্ম হইল।

মানুষ যাহা দেখিত, যাহা শুনিত, তাহাই তাহারা বুঝিতে চাহিত; যাহা বুঝিত না তাহাকে আপনাদের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করিত। জলের গুণ, বায়ুর শক্তি, আগুনের তেজ, তারার আলো, চাঁদের কিরণ, সূর্যের জ্যোতি অনুভব করিয়া তাহারা বিস্মিত হইত, ভীত হইত। তাহারা উহাদিগকে দেবতা বলিয়া মনে করিত এবং প্রার্থনা ও পূজার সাহায্যে তুষ্ট করিতে চাহিত। এই ভাবে তাহাদের মনে ধর্মভাবের উদয় হইল।



আলতামিরার গুহায় অঙ্কিত ছবি

শিল্পের প্রতিও তাহাদের অনুরাগ জন্মিল। এই অনুরাগের আমরা প্রথম পরিচয় পাই গুহার দেওয়ালে আঁকা জন্তুদের ছবি হইতে। স্পেন দেশের **আলতামিরার** গুহায় এইরূপ অনেক ছবি পাওয়া গিয়াছে।

যাহা দেখিতে সুন্দর তাহার প্রতিও মানুষের আকর্ষণ হইল। ইহার ফলে তাহারা নানা রকমের অলঙ্কার তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিল এবং পাত্রের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতে লাগিল।

এইরূপে মানুষ সমাজ গড়িল, ভাষার সৃষ্টি করিল, ধর্মভাব লাভ করিল এবং শিল্পের প্রতি অনুরাগী হইল। এই সব গুণের

সমাবেশকে বলা হয় **সংস্কৃতি**। এই সংস্কৃতিই মানুষকে পশু হইতে ভিন্ন করিয়াছে এবং বড় করিয়াছে।

মানুষের মধ্যেও প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ হইল চেহারায়। সকল দেশের লোকেরা দেখিতে এক রকম নয়। ইংরেজ, কাবুলী, জাপানী, বাঙ্গালীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই তোমরা একথা বুঝিতে পারিবে। এই প্রভেদ কি প্রথম হইতেই ছিল, না পরে হইয়াছে? বেশির ভাগ পণ্ডিতেরাই বলেন—পরে হইয়াছে। তাঁহাদের মতে একই মূল হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে; পরে দেশ-দেশান্তরে যাওয়ায় ঐ সব অঞ্চলের জলবায়ুর প্রভাবে তাহাদের চেহারার পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন হইতেই সৃষ্টি হয় জাতি বিভাগ।

এখন পৃথিবীতে আমরা অনেক জাতি দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে তিনটি প্রধান। তাহারা হইল—ইউরোপের অধিবাসী শ্বেতকায় জাতি, আফ্রিকার অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতি, আর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের পীতকায় জাতি।

পৃথিবীর বেশির ভাগ জাতির উদ্ভব হইয়াছে একাধিক জাতির মিলনের ফলে। এমন জাতি খুব কমই আছে, যাহার সহিত অন্য জাতির মোটেই সংযোগ হয় নাই।

এই ভারতবর্ষে বহু জাতি আসিয়াছে এবং বহু যুগ ধরিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়াছে। তাহাদের মিলনের ফলেই আমাদের উদ্ভব হইয়াছে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শকহুনদল, পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

ঘটনাপঞ্জী

আনুমানিক

খ্রীষ্ট পূর্ব ৫০০,০০০ হইতে

	৩০০,০০০এর মধ্যে	··· মানবের সৃষ্টি
„	৩০০,০০০-১০,০০০	··· পুরাতন প্রস্তর-যুগ
„	১০,০০০-৪,০০০	··· নূতন প্রস্তর যুগ
„	৪,০০০	··· তাম্রের ব্যবহার আবিষ্কার
„	৩,০০০	··· ব্রোঞ্জের ব্যবহার আবিষ্কার
„	১,২০০	··· লোহার ব্যবহার আবিষ্কার

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রথম অবস্থায় মানুষ কিরূপ ছিল? কিরূপেই বা তাহারা জীবনধারণ করিত?

২। আগুন কাজে লাগাইতে শিক্ষা করায় মানুষের কি উপকার হয়?

৩। কৃষিকাজ শিক্ষা করার ফলে মানুষের জীবনে কি কি পরিবর্তন আসে?

৪। কিরূপে মানুষের মনে ধর্মভাবের উদয় হয়?

৫। কি ভাবে বিভিন্ন ভাষার জন্ম হয়?

৬। সংস্কৃতি কাহাকে বলে? সংস্কৃতি মানুষের কি উপকার করিয়াছে?

৭। কিরূপে জাতি বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে?

তৃতীয় অধ্যায়

সুপ্রাচীন সভ্যতার চারিটি অঞ্চল

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি বহু যুগ ধরিয়া অজ্ঞানতার মধ্যে থাকিয়া অবশেষে মানুষ সভ্যতার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। অনেকের মতে প্রথম এই পথের সন্ধান লাভ করে **মিশর ও মেসোপটেমিয়ার** লোকেরা। এই দুইটি দেশ নদীর তীরে অবস্থিত। মিশরের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে নীল নদ আর মেসোপটেমিয়ার দুইটি পাশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্।

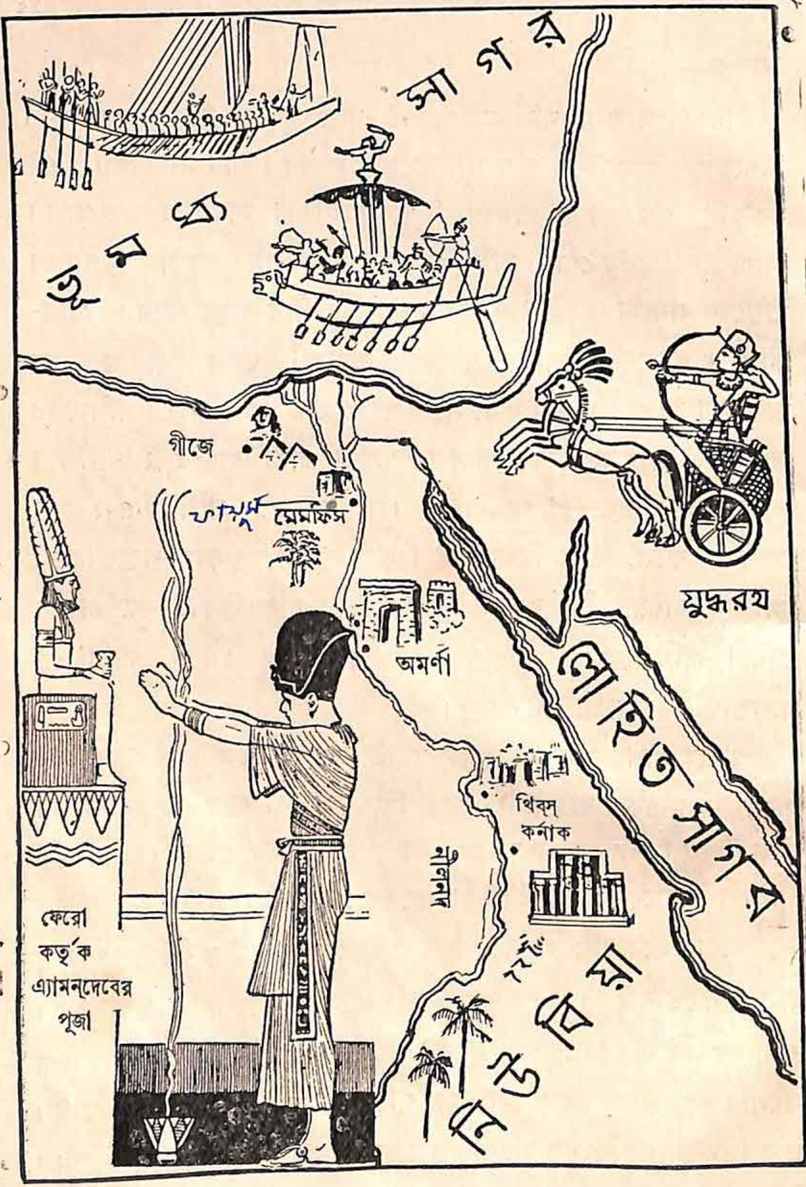
আমাদের সময় হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ঐ দুই অঞ্চলের লোকেরা নগর গড়িতে জানিত। তাহারা বড় বড় পাকা বাড়ি তৈয়ারি করিত। মন্দির এবং সমাধি ভূমি নির্মাণ করিতেও তাহারা পারিত। পূর্বে একই লোককে অনেক কাজ করিতে হইত। যে পাত্র তৈয়ারি করিত তাহাকে ঘর তুলিতে, জমি চাষ করিতে, গরু চরাইতে এবং আরও নানা রকমের কাজ করিতে হইত। মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় কিন্তু একজন লোক এক কাজ লইয়াই থাকিত। যে কাপড় বুনিত, সে কাপড়ই বুনিত। যে ঘর তুলিত, সে ঘরই তুলিত। এই ব্যবস্থার নাম শ্রম-বিভাগ। শ্রম-বিভাগের ফলে যে যে কাজ ভালবাসিত সে সেই কাজ লইয়াই থাকিত; ফলে ঐ কাজে তাহার নৈপুণ্য বাড়িত, কাজটিও হইত সহজ ও সুন্দর।

তাহারা লিখিতেও শিখিয়াছিল। বিভিন্ন রকমের লিখন প্রণালীও তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিল।

মিশর—

মিশরের কথা বলিতে গেলেই বলিতে হয় নীল নদের কথা। মিশরের পশ্চিম দিকে ধূ ধূ করিতেছে সাহারার বিরাট মরুভূমি। এই মরুভূমি এত কাছে থাকায় মিশরের হাওয়া আগুনের মত গরম। আর তাহার জমি পোড়া মাটির মত শুষ্ক। এই অবস্থায় মিশর যে মানুষের বাসযোগ্য হইয়াছে তাহা একমাত্র নীল নদের দয়ায়। গ্রীষ্ম-কালে নীল নদে নামিয়া আসে বন্যার প্রবাহ। তখন ইহার জল কূল ছাপাইয়া বহুদূরে বহিয়া যায়, সঙ্গে লইয়া যায় লাল রংএর পলিমাটির স্তর। ঐ জলকে বাঁধের সাহায্যে ধরিয়া রাখা হয় এবং খালপথে দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। পলিমাটির প্রলেপ এবং জল সেচনের ফলে, ঊষর মিশর হইয়া উঠে সুজল, সুফল, শস্যশ্যামল। যুগ যুগ ধরিয়া নীল নদ এইভাবে মিশরকে আফ্রিকার শস্য-ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই প্রসাদে মিশর হইতে পারিয়াছে সভ্যতার একটি সুপ্রাচীন কেন্দ্র।

প্রথমে মিশর ছিল বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেকটি রাজ্যে ছিল একটি রাজধানী, একটি বিশেষ দেবতা আর একজন রাজা। কিন্তু শীঘ্রই মিশর দেশের অধিবাসীরা বুঝিতে পারে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে তাহাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব ; নীল নদের জল না লইলে দেশে শস্য হইবে না ; আর ঐ জল পাইতে হইলে বাঁধ বাঁধিতে হইবে, খাল কাটিতে হইবে। এই সব কাজ সকলের সহযোগ ছাড়া অসম্ভব। তাহাদের এই একতা বোধের ফলেই মিশরের ছোট ছোট রাজ্যগুলির অবসান হয় এবং উহাদের বদলে গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় রাষ্ট্র। প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরিয়া বহু রাজপরিবার মিশরে রাজত্ব করেন। মিশরবাসীরা তাহাদের রাজাকে বলিত ফেরো।


ভূমধ্য সাগর
গীজে
মেমফিস
অমর্ণা
যুদ্ধরথ
লোহিত সাগর
থিবস্
কর্নাক
নীলনদ
নিউবিয়া
ফেরো
কর্তৃক
এ্যামনদেবের
পূজা

মিশর

এক সময় এশিয়া হইতে **হিক্‌সোস** নামে এক জাতি মিশর জয় করিয়া লয়। প্রায় দুইশত বৎসর রাজত্বের পর তাহাদিগকে **মিশর** ছাড়িয়া পলাইতে হয়।

তাহারা কিন্তু মিশরীদের এক দিক দিয়া উপকারই করিয়া যায়। তাহাদের শাসন কালে মিশরীরা ঘোড়ার ব্যবহার শিক্ষা করে। এতদিন তাহারা ছিল অতিশয় শান্তিপ্রিয়। হিক্‌সোসের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের শক্তির পরিচয় পায়। ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহারা লাভ করে দিগ্‌-বিজয়ের প্রেরণা এবং সেই প্রেরণাকে সফল করিয়া তোলেন সম্রাট **তৃতীয় থাট্‌মোস**। তিনি পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি নগরও জয় করেন। তাঁহার নৌ-বাহিনী ভূমধ্যসাগরেও তাঁহার জয় পতাকা লইয়া যায়।



তৃতীয় থাট্‌মোস



ওসাইরিস

মিশরীদের কিন্তু বিশেষত্ব দিগ্‌বিজয়ে **নয়,** ধর্মের প্রতি তাহাদের অনুরাগে। তাহারা বহু দেবতায় বিশ্বাস করিত। ইঁহাদের **মধ্যে** প্রধান হইলেন পুণ্য ও পরলোকের দেবতা ওসাইরিস, সূর্যের দেবতা

রা ও থিব্‌সের দেবতা এ্যামন্‌। কুকুর, বিড়াল, কুমীর, ভেড়া



রা

প্রভৃতিকেও তাহারা দেবতা বলিয়া পূজা করিত। সমাজে পুরোহিতদের খুব সম্মান ছিল। ধনদৌলত, প্রভাবপ্রতিপত্তি কিছুরই তাহাদের অভাব ছিল না।

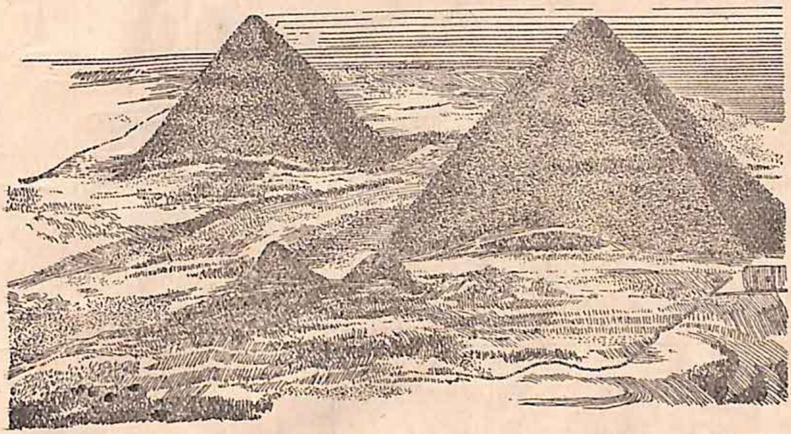
মিশরীরা পরলোক মানিত। তাহাদের ধারণা ছিল কোন লোক মরিয়া গেলেও যতদিন তাহার দেহ অক্ষয় থাকে, ততদিন তাহার জীবন থাকে অটুট। তাই মৃত দেহটিকে অক্ষয় করিয়া রাখা ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ঐ দেহকে লিপ্ত করিত তৈল, মধু, নানা রকমের মস্‌লা এবং অজানা ঔষধে। এই অনুলিপ্ত দেহটিকে বলা হইত 'মামী'। মিশরীরা এই 'মামী'কে একটি শবাধারে পুরিয়া রাখিত। ঐ শবাধারটিকে তাহারা এক অতি গোপন স্থানে রাখিয়া দিত। ঐ স্থানটিকে নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে উহার চারিদিকে তাহারা নির্মাণ করিত একটি সুদৃঢ় সমাধি। তাহারা সমাধির মধ্যে রাখিয়া দিত মৃত লোকটির প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র।



টুটানখামেন

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বে টুটানখামেন নামক এক ফেরোর সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে তাঁহার 'মামী', দুইটি চমৎকার চাঁদোয়া, একখানি বহুমূল্য সিংহাসন, তাঁহার প্রমোদ তরীর কতকগুলি দাঁড়, মাদুলি ও অনেক ধনরত্ন।

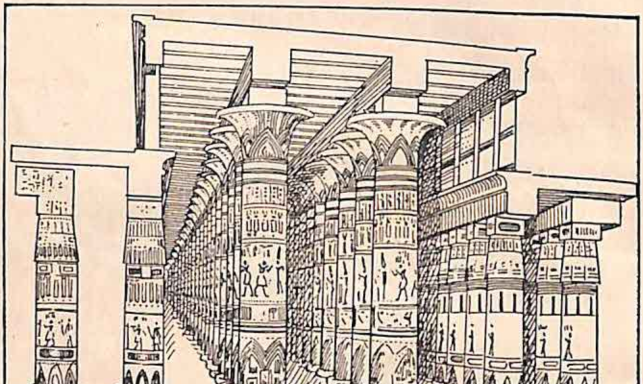
মিশরীরা নানা রকমের সমাধি নির্মাণ করিত। এই সব সমাধির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হইতেছে **পিরামিড**। পিরামিডের আকার



পিরামিড

অতি বিরাট। ইহার ভিত্তি অতি প্রকাণ্ড। ঐ ভিত্তির চারিটি পাশ। প্রত্যেকটি পাশ প্রায় একই মাপের। ইহারা ক্রমশঃ সরু হইয়া উপরে উঠিয়াছে, শেষে একটি চূড়ায় গিয়া মিশিয়াছে। পিরামিড তৈয়ারি হইত পাথরের বড় বড় খণ্ড গাঁথিয়া। কোন মস্‌লা ব্যবহার করা হইত না, তবুও খণ্ডগুলি এমন সুন্দরভাবে জোড়া দেওয়া হইত যে উহাদের মধ্যে একখানা পাতলা ছুরিও ঢুকান যায় না। মিশরীরা সুন্দর সুন্দর মন্দিরও তৈয়ারি করিতে পারিত। কর্নাক নামক নগরে 'এ্যামন'

দেবের মন্দির তাহাদের একটি অমরকীর্তি। এই মন্দিরে একটি প্রকাণ্ড হল ঘর আছে। উহার ছাদটি ধরিয়া রাখিয়াছে সারি সারি পাথরের স্তম্ভ। মধ্যের স্তম্ভগুলি ৭০ ফুট উঁচু। মন্দিরের দেওয়ালে শোভা পাইত বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র।



কর্নাক মন্দিরের প্রধান কক্ষ

মিশরীরা চমৎকার কাপড়, রঙীন কাঁচ এবং নানা রকমের পাত্রও তৈয়ারি করিতে পারিত।

শিক্ষার প্রতিও তাহাদের অনুরাগ ছিল। পুরোহিতদের হাতেই ছিল শিক্ষার ভার। বিদ্যালয় ছিল মন্দিরেরই অঙ্গ।

মিশরীদের লিপির নাম ছিল হাইরোগ্লিফ। এই লিপি লিখিত হইত ছবির সাহায্যে। কালক্রমে মিশরীরা এই লিপি ভুলিয়া গিয়াছিল। ফলে মিশরের প্রাচীন ভাষা জানা এক রকম অসম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই অসম্ভবকেও সম্ভব করেন ফরাসী দেশের অধিবাসী সাঁপলিয়ঁ। রসেটা নগরে একখানা প্রাচীন পাথরের

ফলক পাওয়া যায়। ঐ ফলকে এক রাজার একটি আদেশ হাইরোগ্লিফ, গ্রীক ও আরও একটি লিপিতে ক্ষোদিত ছিল। সাঁপলিয় গ্রীক লিপিটির সহিত তুলনা করিয়া হাইরোগ্লিফের রহস্য উদ্ধার করেন।



হাইরোগ্লিফ

তাঁহার এই সাফল্যের ফলেই আজ আমরা মিশরের প্রাচীন ভাষা ও অতীত ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি।

মেসোপটেমিয়া—

এই অঞ্চলে আমরা যাহাদের হাতে সভ্যতার প্রদীপখানি প্রথমে দেখিতে পাই, তাহারা **সুমেরীয়** নামে পরিচিত। সুমেরীয়গণ জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই উন্নতি করিয়াছিল। তাহারা খাল কাটিয়া তাহাদের ক্ষেতগুলি শস্যে ভরিয়া তুলিত, জলাভূমি আবাদ করিয়া নগর পত্তন করিত, কাপড় তৈয়ারি করিত এবং শস্য বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিত। বল্লম, তামার শিরস্ত্রাণ ও ঢালের ব্যবহার তাহাদের অজানা ছিল না। তাহারা একপ্রকার লিখন প্রণালীও সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রণালীর অক্ষরগুলি নরম মাটির ফলকের উপর খাগের কলমের সাহায্যে লেখা হইত। এই সব অক্ষরের আকার হইত কীলকের আকারের ন্যায়। তাই ঐ লিখন প্রণালীর নাম ছিল 'কিউনিফরম' (কীলক আকৃতি)।

সুমেরীয়দের প্রত্যেকটি নগর ছিল এক একটি স্বাধীন রাজ্য। প্রত্যেক নগরেই ছিল একজন করিয়া দেবতা। এই রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়াই

থাকিত। শেষে বেবিলন নগরের অধিবাসীরা সমস্ত মেসোপটেমিয়া জয় করিয়া একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। ফলে যে সভ্যতার উদয় হয় তাহার নাম **বেবিলনীয় সভ্যতা**। বেবিলনীয় সম্রাট্‌গণের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইতেছেন হাম্মুরাবী ও নেবুকাড্‌নেজার।

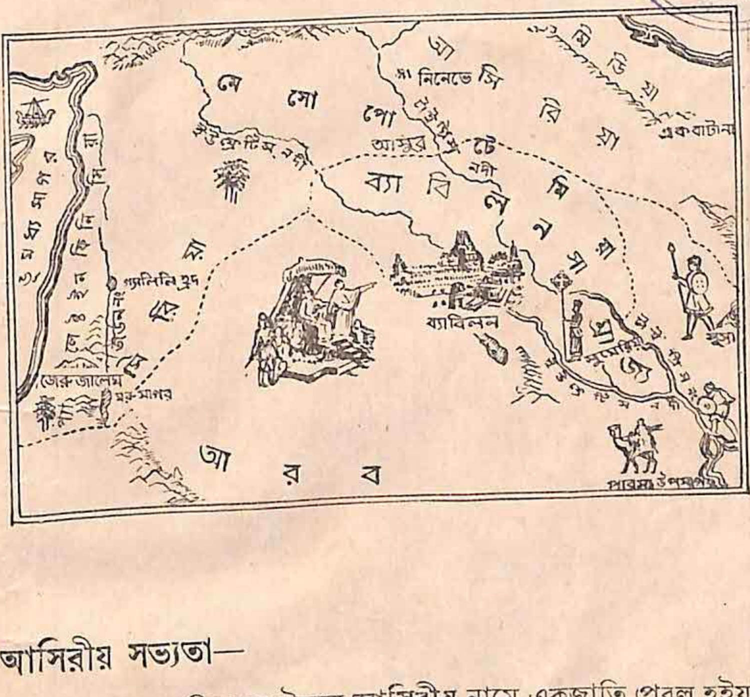
হাম্মুরাবী ছিলেন একাধারে দিগ্‌বিজয়ী এবং বিধানদাতা। তিনি একখানা বড় পাথরের উপরে অনেকগুলি বিধান বা আইন লিখিয়া রাখেন। ঐ পাথরখানি পাওয়া গিয়াছে।



হামরাবী সূর্য দেবতার নিকট হইতে আইনের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিতেছেন।

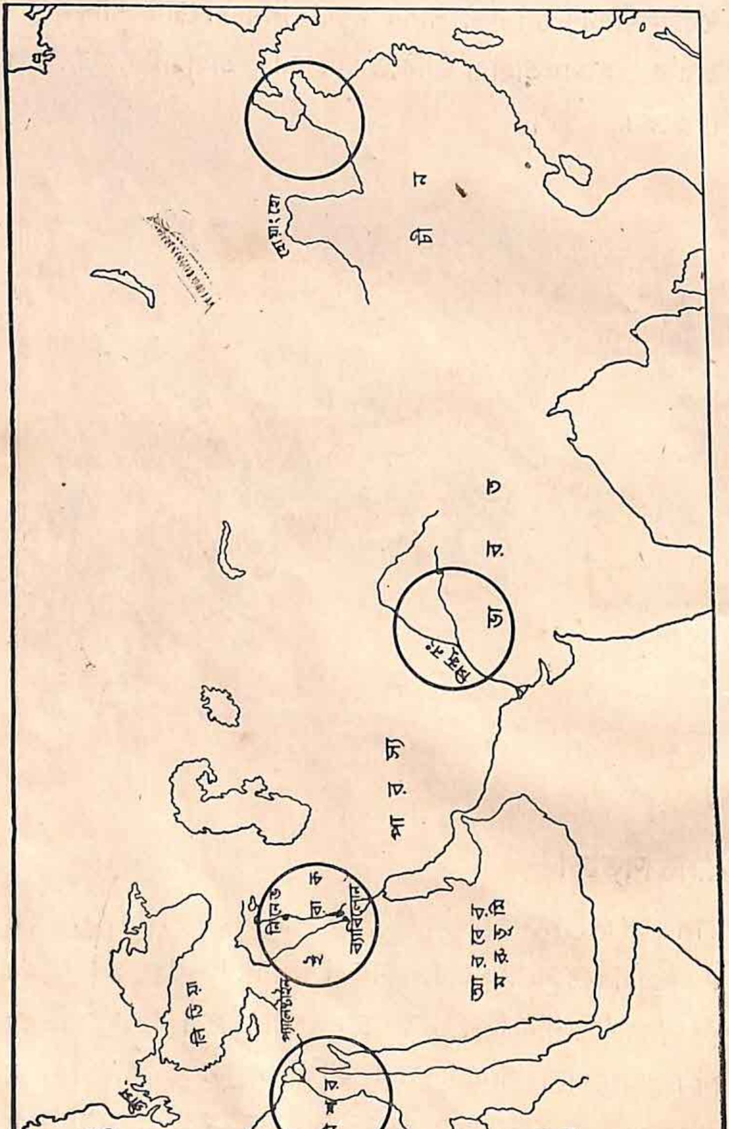
নেবুকাড্‌নেজার বেবিলনকে একটি মহানগরে পরিণত করেন। এই নগরের চারিদিকে নির্মিত হয় একটি বিরাট প্রাচীর। উহার উপরে দুই পাশে দুই সারি পাকাবাড়ি; তবুও মধ্যের রাজপথ দিয়া একখানি রথ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত। নগরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছিল একটি প্রকাণ্ড রাজপথ। এই রাজপথের একস্থানে ছিল একটি সুদৃশ্য তোরণ। নগরের মধ্যে ছিল অসংখ্য ইমারত। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হইল শূন্যোদ্যান। এই ইমারতটি ছিল ৩৫০ ফুট উঁচু। ইহার অনেকগুলি তলা। প্রতি তলার ছাদে আবার নানারকমের পরম সুন্দর ফল ও ফুলের গাছ। দেখিলে মনে হইত শূন্যে একটি উদ্যান ঝুলিতেছে। তাই ইহার নাম হইয়াছিল **শূন্যোদ্যান**। প্রাচীন যুগের লোকেরা এই উদ্যান দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা ইহাকে পৃথিবীর সাতটি পরম আশ্চর্য বস্তুর একটি বলিয়া মনে করিত।

বেবিলনীয়গণ শুধু যুদ্ধ, শাসন অথবা শিল্প লইয়াই থাকিত না। গ্রহতারার রহস্যও তাহারা জানিতে চাহিত। তাহারাই নক্ষত্র বিদ্যার সূচনা করে।



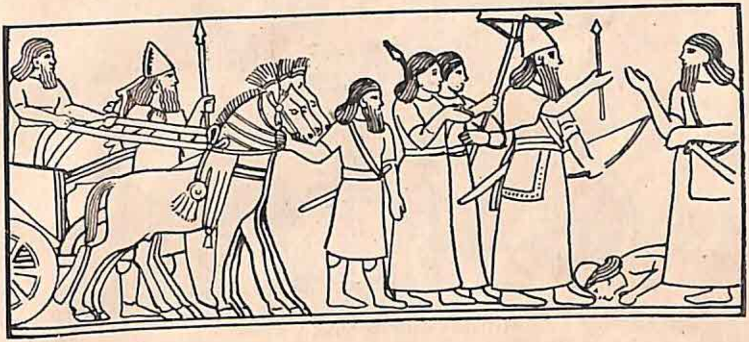
আসিরীয় সভ্যতা—

কালক্রমে বেবিলনের উত্তরে **আসিরীয়** নামে একজাতি প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা মেসোপটেমিয়া, এমন কি মিশর পর্যন্ত জয় করে। ইহাদের রাজধানীর নাম ছিল নিনেভে। আসিরীয়রা ছিল অতিশয় রণপ্রিয়। আলখাল্লা পরিয়া, লম্বা দাড়ি ও চুল দোলাইয়া যখন তাহারা যুদ্ধে যাইত তখন তাহাদিগকে মূর্তিমান্ অসুরের মতই মনে হইত। ইহারা ছিল অতিশয় নির্মম। পরাজিত শত্রুকে শূলে দিয়া,



পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার চারিটি কেন্দ্র

আগুনে পোড়াইয়া এমন কি চামড়া খসাইয়া মারিতেও ইহারা দ্বিধা করিত না।



আসিরীয়দের যুদ্ধরথ

নির্মম হইলেও আসিরীয়গণ সভ্যতার উন্নতি করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারাই প্রথমে রথ ও অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যবহার করে। দুর্গ চূর্ণ করিবার একটি শক্তিশালী যন্ত্রও তাহারা আবিষ্কার করে। বিদ্যার প্রতিও তাহাদের অনুরাগ ছিল। আ সু র বা নি পা ল নামে তাহাদের একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগারে কুড়ি হাজার মাটির ফলকলিপি পাওয়া গিয়াছে।

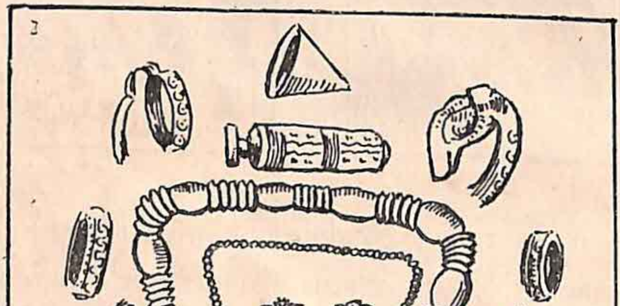


আসিরীয় মাটির ফলকলিপি

আসিরীয়দের ভাস্কর্যেও অসাধারণ বৈ[illegible]ছিল।

লম্বা ও ১০৮ ফুট চওড়া। ইহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সাঁতার কাটিবার চৌবাচ্চা। উহার দুই পাশে দুই সারি সিঁড়ি, আর চারিদিকে বসিবার আসন। বাহির হইতে চৌবাচ্চায় জল আনা হইত এবং প্রয়োজন মত ঐ জল সরাইয়া দেওয়া হইত।

শহর গড়িয়া এবং উহাকে সুন্দর ও সুখের নিকেতন করিয়াই, সিন্ধুতীরের লোকেরা ক্ষান্ত হয় নাই। পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে তাহারা



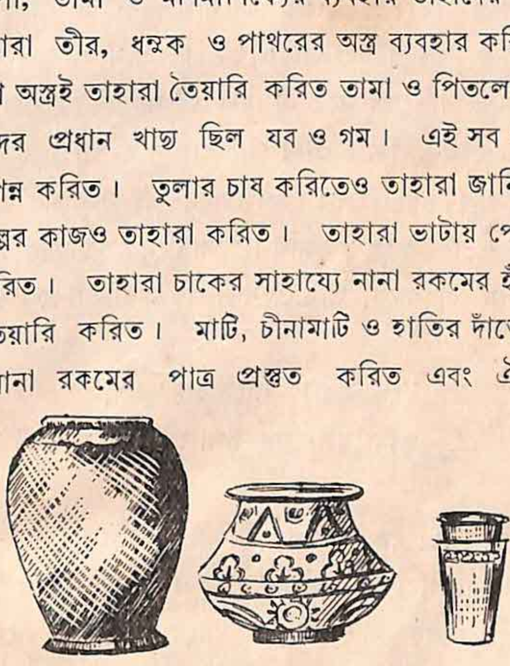
সিন্ধুতীরের অধিবাসীদের অলঙ্কার

সুরুচির পরিচয় দিয়াছে, কৃষিশিল্পের বিকাশ করিয়াছে এবং বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছে। ধর্মের মানও তাহারা উন্নত করিয়াছে।

সাধারণতঃ তাহারা তুলার জামা পরিত। পশমের জামাও পরিতে তাহারা জানিত। নানা রকমের অলঙ্কার পরিতে তাহারা ভালবাসিত। পুরুষেরাও অলঙ্কার পরিত।

সে যুগের লোকেরা সম্ভবতঃ লোহার ব্যবহার জানিত না। কিন্তু সোনা, রূপা, তামা ও মণিমাণিক্যের ব্যবহার তাহাদের অজানা ছিল না। তাহারা তীর, ধনুক ও পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত। কিন্তু বেশির ভাগ অস্ত্রই তাহারা তৈয়ারি করিত তামা ও পিতলের সাহায্যে।

তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল যব ও গম। এই সব শস্য তাহারা ক্ষেতে উৎপন্ন করিত। তুলার চাষ করিতেও তাহারা জানিত। নানা রকম শিল্পের কাজও তাহারা করিত। তাহারা ভাটায় পোড়াইয়া ইট তৈয়ারি করিত। তাহারা চাকের সাহায্যে নানা রকমের হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি তৈয়ারি করিত। মাটি, চীনামাটি ও হাতির দাঁতের সাহায্যে তাহারা নানা রকমের পাত্র প্রস্তুত করিত এবং ঐগুলি নানা



সিন্ধুতীরের অধিবাসীদের কয়েকটি পাত্র

রঙ্গে রঙ্গিন করিয়া তুলিত। তাহারা মানুষ ও পশুর মূর্তি গড়িত। তাহারা শিশুদের জন্য নানা রকমের খেলনা প্রস্তুত করিত এবং সোনা, রূপা, হাতির দাঁত ও বহুমূল্য পাথরের অলঙ্কার গড়িত। তাহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এমন কি উহার বাহিরে গিয়াও বাণিজ্য করিত।

হরপ্পা কিংবা মহেঞ্জোদড়োতে এখন পর্যন্ত কোন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাই বলিয়া উহাদের অধিবাসীরা ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিল—এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। তাহারা এক মহাদেবীর উপাসনা করিত। সম্ভবতঃ শিবের উপাসনাও ইহাদের অজানা ছিল না।

সিন্ধুতীরের সভ্যতার সহিত মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। অনেক পণ্ডিতের মতে ঐ মিল এই সম্পর্কেরই ফল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধুতীরের সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। কালক্রমে এই সভ্যতার অবসান হয়। কিন্তু ইহার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। আমাদের সভ্যতার মধ্যে ইহার প্রভাব লুকান রহিয়াছে, তাই ঐ সভ্যতার কথা ভাবিলে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে,
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে।"

চীন—

চীন দেশে অনেক পুরাণ কাহিনী প্রচলিত আছে। এগুলি আমাদের দেশের পুরাণ কাহিনীর অনেকটা অনুরূপ। এইসব কাহিনী পড়িয়া চীন দেশের লোকেরা কি ভাবে সভ্যতার পথে আগাইয়া গিয়াছিল—সে কথা জানা যায়।

অতি প্রাচীনকালে তাহারা পাকাবাড়ি নির্মাণ করিতে, রেশম তৈয়ারি করিতে, বই লিখিতে, গান করিতে, এমন কি ছবি আঁকিতেও পারিত। চুম্বকের ব্যবহারও তাহাদের অজানা ছিল না। হিংস্র পশু বধ করিয়া এবং বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তাহারা জনপদ গড়িয়া তুলিত। বন্যার জল বাঁধিয়া তাহারা কৃষির উন্নতি করিত।

পৃথিবীর বিষয় লইয়াই তাহারা মগ্ন থাকিত না। গ্রহতারার রহস্য জানিবারও তাহাদের আগ্রহ ছিল সুপ্রচুর। এই উদ্দেশ্যে তাহারা একটি মান-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল।



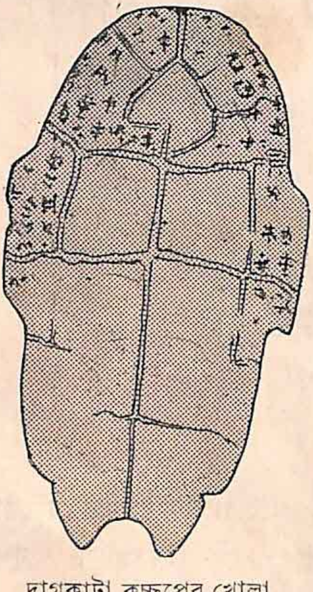
চীনা লিপি

প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে চীনে **শাং** বা **ঈন** বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় হইতেই ঐ দেশে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের যুগ আরম্ভ হয়। এই বংশের রাজাদের শাসনকালে চীনে প্রথম বড় রকমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার রাজধানী একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ইহাকে বলা হইত 'ঈনের স্তূপ'। কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্তূপ খুঁড়িয়া ঈন যুগের অনেক নিদর্শন বাহির করা হইয়াছে। এইসব নিদর্শন দেখিয়া আমরা সে সময়কার অনেক কথা জানিতে পারি।

আমরা জানিতে পারি ঐ সময়ে চীনারা তীর, ধনুক ও বল্লম লইয়া শিকার করিত এবং ঐ সব শিকারের ছবি আঁকিতেও পারিত।

তাহারা ব্রোঞ্জ দিয়া জিনিষপত্র তৈয়ার করিতে পারিত। মাটি দিয়া পাত্র গড়িয়া তাহারা কারুকার্যে মণ্ডিত করিত। বাসন কলাই করিতেও তাহারা জানিত।

তাহারা অনেক দেবতা মানিত। পূর্ব পুরুষগণকে তাহারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। এই যুগের পুরোহিতেরা কচ্ছপের খোলার উপর নানা রকম দাগ কাটিয়া লোকের ভবিষ্যৎ গণনা করিতেন। ঈন রাজধানীতে এইরূপ অনেকগুলি কচ্ছপের খোলা পাওয়া গিয়াছে।



দাগকাটা কচ্ছপের খোলা

শাং বা ঈন রাজবংশ শেষ হইবার কিছু পরে **চাউ** রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশে **উ** নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি দেশের বিশিষ্ট লোকদিগকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া উহাদের প্রত্যেককে জমিদার করিয়া দেন। যাহারা ইহাদের অধীনে জমি ভোগ করিত, তাহারা ইহাদিগের অনুগত থাকিত, এবং ইহাদের জন্য মাছ, মাংস, কাঠ, কাপড় প্রভৃতি সরবরাহ



চাউ যুগের শিল্প

করিত। জমিদারেরা কিন্তু খুসিমত চলিতে পারিত না। রাজসভায় গিয়া তাহাদিগকে জানাইতে হইত তাহাদের এলাকায় কৃষি ও শিল্পের কাজ কিরূপ চলিতেছে। পাঁচ বৎসর অন্তর রাজা দেশ পরিদর্শনে বাহির হইতেন। কোন জমিদার অন্যায় করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতেন, কেহ ভাল কাজ করিলে তাহাকে পুরস্কৃত করিতেন।

প্রত্যেক লোককেই একখণ্ড জমি দেওয়া হইত। ৬০ বৎসর পর্যন্ত সে ঐ জমি চাষ করিত। ইহার পরেও বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে আর কাজ করিতে হইত না। তাহাকে বৃত্তি দেওয়া হইত।

চাউ বংশের রাজত্বকালে চীনের পরম জ্ঞানী **কনফিউসিয়াসের** জন্ম হয়। তাঁহার লিখিত ইতিহাস হইতে আমরা ঐ সময়ের অনেক কথা জানিতে পারি।



চাউ যুগের পাত্র

ঘটনাপঞ্জী

মিশর		মেসোপটেমিয়া		ভারতবর্ষ		চীন	
আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ		আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ		আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ		আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ	
✓ ৩,৪০০	মিশরের প্রথম রাজবংশ	৪,০০০	সুমেরীয়দের বসতি স্থাপন	২,৭৫০–২,৫০০	মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সভ্যতার যুগ	২,৭০০–২,২৫৫	চীনের প্রাচীতম সম্রাটের যুগ
২,৯০০–২,৭৫০	পিরামিডের যুগ	২,১০০	হাম্মুরাবী			১,৭৬৬–১,১২৩	সাঙ্ বা ইন্‌বংশের রাজত্বকাল
১,৮০০	হিকসোসের মিশর বিজয়	৭৫০–৬১২	আসিরীয় সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি			১,১২২–২৫০	চাউ বংশের রাজত্বকাল
১,৬০০	হিকসোসের মিশর হইতে বহিষ্কার	৬৬৯-২৬	আস্থরবানিপাল				
১,৫০০	তৃতীয় থাট্‌মোস্	৬১২	নিনেভে ধ্বংস নেবুকাড্‌নেজার				
১,৩৫০	টুটেনখামেন	৫৩৯	সাইরাস কর্তৃক বেবিলন বিজয়				
৬৭১	আসিরীয়দের মিশর বিজয়						
৫২৫	পারসিকদের মিশর বিজয়						

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নীল নদ কিরূপে মিশরকে যুগ যুগ ধরিয়া আফ্রিকার শস্য ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছে ?

২। কি অবস্থায় মিশরের জাতীয় রাষ্ট্রের সূচনা হয় ?

৩। হিকসোস কাহারা ? তাহাদের নিকট মিশরীরা কেন ঋণী ?

৪। তৃতীয় থাট্‌মোস কে ? কি কারণে তিনি স্মরণীয় হইয়াছেন ?

৫। মিশরীরা মৃতদেহকে কি কারণে এবং কি ভাবে অক্ষয় করিতে চেষ্টা করিত ? পিরামিড কাহাকে বলে ?

৬। কর্ণাকের মন্দিরকে কি কারণে মিশরীদের একটি অমর কীর্তি বলা হয় ?

৭। হাইরোগ্লিফ কাহাকে বলে ? কাহার সাধনার ফলে হাইরোগ্লিফের রহস্য উদ্ধার হয় ?

৮। সুমেরীয়গণ সভ্যতার কি কি উন্নতি করে ?

৯। হাম্মুরাবী ও নেবুকাডনেজার কি কারণে স্মরণীয় হইয়াছেন ?

১০। আসিরীয়গণ পৃথিবীর কি উপকার করিয়াছে ?

১১। সিন্ধুতীরের লোকেরা নগর গড়িয়া উহাকে সুন্দর ও সুখের নিকেতন করিতে পারিত—এইরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে ?

১২। সিন্ধুতীরের লোকেরা ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিল না—এই কথা প্রমাণ কর।

১৩। চীনের প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে যে সভ্যতা-বিকাশের আভাষ পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৪। ঈণ যুগের চীনাদের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৫। সম্রাট উ'র শাসন সংস্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্যদের আবির্ভাব

আমরা সভ্যতার সূচনার কথা বলিয়াছি, উহার উন্নতির কথা বলিয়াছি। এইবার উহার আরও উন্নতির কথা বলিতেছি। এই উন্নতি যাহারা সাধন করে তাঁহাদিগকে বলা হয় আর্য।

সংস্কৃত, ইরাণীয়, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি পৃথিবীর কতকগুলি প্রধান ভাষার সম্ভবতঃ জন্ম হইয়াছে একটি সাধারণ ভাষা হইতে। অনেক পণ্ডিতের মতে যাহারা এই মূল ভাষা ব্যবহার করিত তাহাদের নাম আর্য।

আর্যগণ প্রথমে কোথায় বাস করিত তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, ঐ স্থানটি ছিল মধ্য-এশিয়া অথবা ইউরোপের পূর্ব কিংবা মধ্য অংশে। কালক্রমে আর্যগণ তাহাদের আদিবাসভূমি ছাড়িয়া নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অনেকে যায় গ্রীস ও ইউরোপের আরও কয়েকটি অঞ্চলে, অনেকে বসতি স্থাপন করে ইরাণে, আর অনেকে প্রবেশ করে ভারতবর্ষে।

বৈদিক আর্যদের কথা—

যে সকল আর্য ভারতবর্ষে আসে, বেদে আমরা তাহাদের পরিচয় পাই, তাই তাহাদিগকে বলা হয় বৈদিক আর্য। এখন আমরা এই বৈদিক আর্যগণের কথাই বলিতেছি।

আমাদের সময় হইতে প্রায় ৩,৫০০ বৎসর পূর্বে এই আর্যগণ ভারতবর্ষে আসে। প্রথমে তাহারা পঞ্জাবের অধিবাসিগণকে পরাজিত

করিয়া ঐস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে। যুদ্ধ জয় করিয়া এবং বসতি স্থাপন করিয়াই আর্যদের প্রতিভা শেষ হয় নাই। এই প্রতিভার প্রেরণায় তাহারা সৃষ্টি করে বিরাট একটি সাহিত্য। এই সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অবদান হইতেছে **বেদ**। বেদ কথাটির অর্থ **জ্ঞান**। কিন্তু বেদ বলিতে আর্যগণ সাধারণ জ্ঞান বুঝিত না। যাহা জ্ঞানেরও উপরে, আর্যদের নিকট বেদ ছিল সেই পরম দিব্য জ্ঞানের আধার। বেদ চারিভাগে বিভক্ত। ইহাদের নাম **ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ** ও **অথর্ববেদ**। এই সব বেদের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং অনেক অংশে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল ঋগ্‌বেদ। ঋগ্‌বেদের প্রধান অংশের নাম **ঋক্ সংহিতা** (স্তবমালা)। ঋক্-সংহিতায় ১,০২৮টি **ঋক্** বা **স্তব** আছে। ইহারা আবার দশটি ভাগে বা মণ্ডলে বিভক্ত। ঋক রচিত হইত দেবতাদের উদ্দেশ্যে। ইহাদের সাহায্যে আর্যেরা তাঁহাদের উপাসনা করিত।

সৌন্দর্যের প্রতি আর্যদের অনুরাগ ছিল গভীর। তাহাদের কল্পনাও ছিল প্রখর। প্রকৃতির বিচিত্ররূপে তাহারা বিস্মিত হইত, মুগ্ধ হইত। উষার স্তবের মধ্যে তাহাদের এই পুলকিত বিস্ময়ের পরিচয় পাই।

ঐ স্তবের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

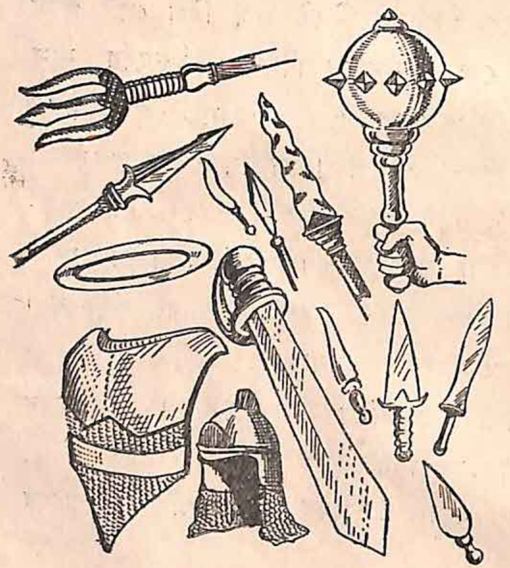
* "ভাস্বতী উষা হর্ষবাণী সে মূর্তিমতী—
শোভে বিচিত্রা, খুলিয়াছে দ্বার বিপুল অতি,
উজলি' আলোকে বিশ্বজগৎ সম্পদ্ যত
দেখাল মানবে, করিলা ভুবনে কর্মরত।"

---

* চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত, প্রণীত "বেদবাণী" হইতে উদ্ধৃত।

আর্যগণ জীবনকে আনন্দের উৎস বলিয়া মনে করিত। তাহারা প্রার্থনা করিত—তাহারা যেন অন্ততঃ একশত বৎসরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

আর্যগণ ছিল বীর্যবান্। যুদ্ধকে তাহারা ভয় করিত না। প্রয়োজন হইলে তীর, ধনুক, কুঠার, বল্লম ও তরবারি লইয়া তাহারা শত্রুর সম্মুখীন হইত। যুদ্ধ শেষে আবার তাহারা তাহাদের শান্তিময় জীবনে ফিরিয়া আসিত। তাহাদের সাধারণ জীবন ছিল আড়ম্বরহীন। জমি চাষ করিয়া অথবা পশু-পালন করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। তবুও তাহারা জীবনকে উপভোগ করিতে চাহিত। ইহার মান উন্নত করিতে তাহারা যত্নের ত্রুটি করিত না। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল যব ও গম এবং জলের পরেই প্রধান পানীয় ছিল দুগ্ধ। মাছ ও মাংস খাইতেও তাহাদের দ্বিধা ছিল না। সময় সময় তাহারা একপ্রকার লতার রস পান করিত, ইহার নাম ছিল **সোমরস**। তাহারা সাধারণতঃ তুলা কিংবা রেশমের পোষাক পরিত এবং মাথায় পাগড়ী বাঁধিত। মেয়েরা নানারকম সোনার অলঙ্কার পরিত। ফুল



বৈদিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র

দিয়া সাজিয়াও তাহারা আপনাদের সৌন্দর্য বাড়াইয়া তুলিত। আর্যেরা খেলাধূলা করিতেও ভালবাসিত, ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল পাশা খেলা, রথ চালনা এবং মৃগয়া। গানের প্রতিও তাহাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

আর্যদের প্রধান বিশেষত্ব ছিল ধর্মের প্রতি তাহাদের অনুরাগ। তাহারা অনেক দেবতার উপাসনা করিত। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র (সূর্য), অগ্নি প্রভৃতি। অগ্নিতে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, সোমরস প্রভৃতি দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়িয়া ও গান করিয়া তাহারা ঐ সকল দেবতার উপাসনা করিত। উপাসনার এই পদ্ধতির নাম **যজ্ঞ**। আর্যেরা অনেক দেবতার পূজা করিত। কালক্রমে তাহারা বুঝিতে পারে ইঁহারা সকলে একই দেবতার অংশ। এই পরম দেবতাকে তাহারা বলিত **ব্রহ্ম**। তাহারা বিশ্বাস করিত ব্রহ্ম সকল জায়গায় এবং সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন। অথচ তিনি সুখ ও দুঃখের উপরে। তাহাদের এই বিশ্বাস তাহারা উপনিষদে প্রকাশ করে। **উপনিষদ্** বেদেরই অংশ, ঋক্-রচনার অনেক পরে উপনিষদ্ রচিত হয়।

উপনিষদে অনেক কাহিনী আছে। ইহাদের মধ্যে নচিকেতার কাহিনী বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। নচিকেতা ছিলেন গৌতম ঋষির পুত্র। তিনি যমালয়ে গিয়া যমের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান জানিতে চাহেন। যম প্রথমে তাঁহাকে ঐ জ্ঞান দিতে অস্বীকার করেন। তিনি নচিকেতাকে উহার পরিবর্তে জন, ধন, মান, এমন কি অমর জীবন পর্যন্ত দিতে চাহেন। কিন্তু কোন প্রলোভনই নচিকেতাকে ভুলাইতে পারে নাই। অবশেষে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া যম অতিশয় প্রীত হন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেন।

আর্যদের অধিকার বিস্তার—

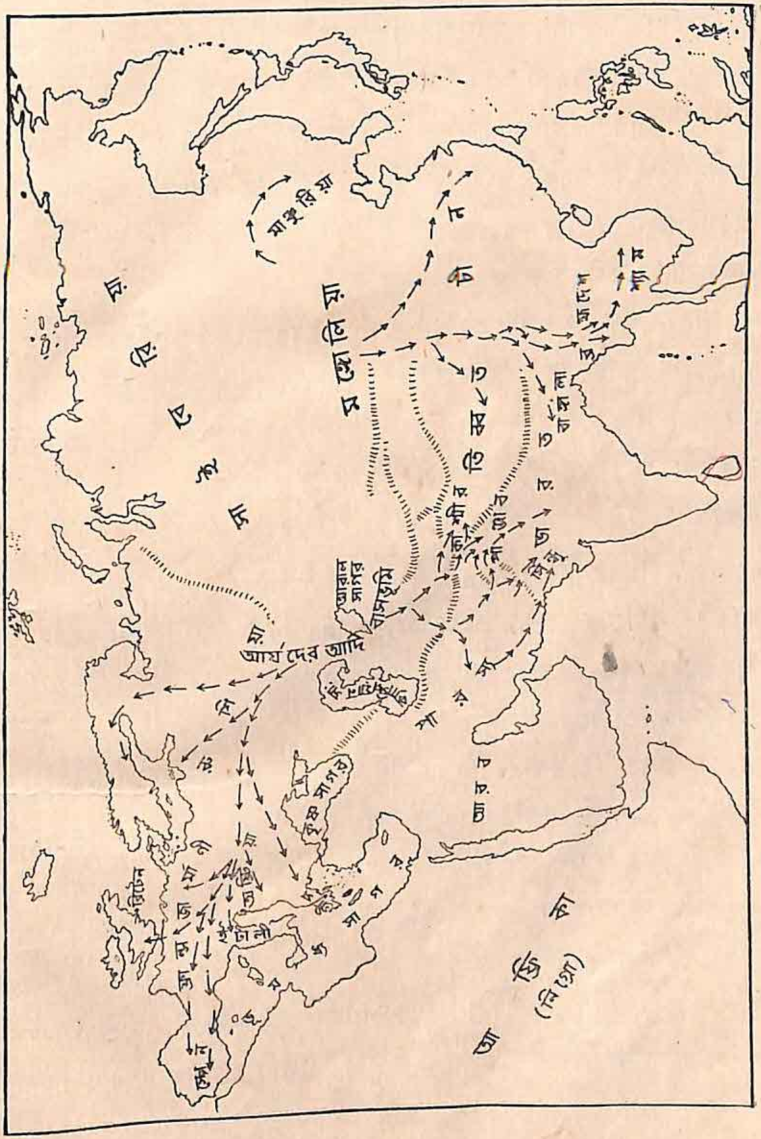
আর্যগণ পঞ্জাব জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ধীরে ধীরে তাহারা উত্তর ভারতের প্রায় সব জায়গায় অধিকার বিস্তার করে। তাহাদের নাম অনুসারে উত্তর ভারতের নাম হয় আর্যাবর্ত। অনার্যগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা দক্ষিণ ভারতও জয় করে। তাহারা তাহাদের অধিকৃত স্থানে অনেক রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করে। এইসব রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত। যে রাজা অনেক রাজাকে পরাজিত করিতেন তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিতেন এবং **রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ** করিয়া তাঁহার সার্বভৌম অধিকার সূচিত করিতেন।

রাজসূয় যজ্ঞের সময় অধীন রাজারা আসিয়া সম্রাটের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। পুরোহিত তাঁহার অভিষেক করিতেন। সম্রাট উপস্থিত সকলকে সমাদর করিতেন এবং রাজপুরুষদের মধ্যে উপহার বিতরণ করিতেন।



অশ্বমেধের অশ্ব

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে, একটি ঘোড়াকে ছাড়িয়া দিতে হইত। উচ্চবংশের একদল যুবক অস্ত্র লইয়া তাহার সঙ্গে যাইত। কেহ ঘোড়াটিকে আটক করিলে তাহাকে পরাজিত করিয়া ঘোড়াটিকে মুক্ত করিতে হইত। এক বৎসর পরে ঘোড়াটিকে রাজ্যে ফিরাইয়া আনা হইত। ঘোড়াটি নিরাপদে ফিরিয়া আসিলে, প্রমাণ হইত, সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তখন ঐ ঘোড়াটিকে বলি দিয়া মেধ বা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হইত।



আর্যদের বসতি বিস্তার

বৈদিক রাজারা শুধু তাহাদের প্রভুত্ব বাড়াইয়া তুলিতেই চাহিতেন —এরূপ ভাবিবার কিন্তু কোন কারণ নাই। তাঁহারা শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতেন এবং দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। তাঁহারা দুষ্টের দমন করিতেন এবং শিষ্টের পালন করিতেন। তাঁহাদিগকে প্রজাদের প্রিয় হইতে হইত এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতে হইত।

রাজসভায় পুরোহিতের বিশেষ মান ছিল। পুরোহিত রাজাকে অভিষিক্ত করিতেন, শাসনকার্যে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং কবিতার সাহায্যে তাঁহার জয়শ্রীকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেন।

ইরাণ—

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আর্যদের অনেকে ইরাণে বসতি স্থাপন করে। ইহাদের ভাষা হইতেই প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার উদ্ভব হয়। ইরাণীয় আর্যগণ বহু দেবতার উপাসনা করিত। এই সব দেবতা বৈদিক দেবতাদের অনুরূপ।

কালক্রমে ইরাণ দেশে জরথুষ্ট্র নামে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি এক নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মতে জগতে দুইটি শক্তি, একটি শুভ, আর একটি অশুভ। শুভ শক্তির কর্তা হইলেন ভগবান্ আহুরমাজ্‌দা এবং অশুভ শক্তির পাণ্ডা হইলেন আহ্রিমন।

অনেকের ধারণা ইরাণীয় আর্যগণ অগ্নির উপাসনা করিত। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। তাহারা অগ্নিকে শ্রদ্ধা করিত মাত্র। তবে ইহাকে অনির্বাণ রাখা তাহারা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন ইরাণীরা শুধু আগুনকে নয়, জল ও মাটিকেও পবিত্র মনে করিত। তাই কেহ মারা গেলে তাহারা তাহার দেহ জলে ফেলিত না, আগুনে

পোড়াইত না, মাটিতেও কবর দিত না। তাহারা মৃতদেহটি একটি উঁচু খোলা জায়গায় রাখিয়া দিত। হিংস্র পাখিরা আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত।

ভারতবর্ষে পার্শী নামে এক সম্প্রদায় আছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইরাণীয় আর্যদের বংশধর। ইহারা এখনও পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার মানিয়া চলে।

হোমারের যুগের গ্রীস—

যে সকল আর্যেরা গ্রীসে আসিয়াছিল এইবার তাহাদের কথা বলিতেছি। গ্রীস দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি উপদ্বীপ। গ্রীসের অধিবাসীদিগকে বলা হয় গ্রীক। ইহাদের অনেকে আর্যদের বংশধর।

গ্রীসে অনেক চারণ কবি বাস করিতেন। ইহারা প্রাচীন কাহিনী লইয়া কবিতা রচনা করিতেন এবং ঐগুলিকে গান করিয়া শুনাইতেন। হোমার ছিলেন ইঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবন কথা আমরা ভাল করিয়া জানি না। অনেকের ধারণা তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি গীত রচনা করিতেন এবং ঐ গীত শুনাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। অনেকের মতে তিনি দুইখানি মহাকাব্যও রচনা করেন। ইহাদের নাম **ইলিয়ড ও ওডিসি**।



হোমার

ইলিয়ডের বিষয় হইল গ্রীসের সহিত ট্রয়ের যুদ্ধ। ট্রয় ছিল এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত একটি শক্তিশালী নগর। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস স্পার্টার রাণী হেলেনকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। তখন গ্রীকগণ ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দশ বৎসর তাহারা ঐ নগর অবরোধ করিয়া রাখে; তবুও তাহারা ট্রয়

প্রধান সেনাপতি। এত ক্ষমতা পাইয়াও রাজা কিন্তু ইচ্ছামত চলিতে পারিতেন না। তাঁহাকে দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য চালাইতে হইত। প্রথমটি ছিল প্রবীণদিগের সভা, আর দ্বিতীয়টির সভ্য ছিল জনসাধারণ। কালক্রমে সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা রাজার অনেক ক্ষমতাই কাড়িয়া লয়। কোন কোন নগর হইতে রাজ্যশাসন একেবারেই চলিয়া যায়।



এ্যাথিনা

গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল—তাহাদের দেবতারা বাস করেন অলিম্পাস পাহাড়ের উপরে। এই সব দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বর্গের দেবতা জিউস, সূর্যের দেবতা অ্যাপোলো এবং বিদ্যা ও ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ্যাথিনা।

গ্রীকরা আরও বিশ্বাস করিত—তাহারা একই পূর্ব-পুরুষের বংশধর এবং পরস্পরের আত্মীয়।

ঘটনাপঞ্জী

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ	আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ
১,৫০০ আর্যদের ভারতে আগমন	সপ্তম শতাব্দী (?)
১,২০০ ঋগ্বেদ রচনার কাল	জরথুষ্ট্র
৬০০ উপনিষদের যুগ আরম্ভ	১,২০০ ট্রয় ধ্বংস
	৯০০ হোমার

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আর্য কাহারা? তাহাদের আদি বাসভূমি কোথায়?

২। বৈদিক আর্যগণ জীবনকে উপভোগ করিতে চাহিতেন—এরূপ মনে করিবার কি কোন কারণ আছে?

৩। বেদ কাহাকে বলে? বেদ কয়ভাগে বিভক্ত?

৪। ঋকসংহিতা কাহাকে বলে? ঋক কেন রচিত হয়?

৫। বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন অনুষ্ঠিত হইত? ঐ দুইটি যজ্ঞ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। 'বৈদিক রাজারা শুধু তাহাদের প্রভুত্ব বাড়াইয়া তুলিতেই চাহিতেন'—এরূপ ভাবিবার কিন্তু কোন কারণ নাই।—এই উক্তি সপ্রমাণ কর।

৮। জরথুষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৯। প্রাচীন ইরাণীরা কি কারণে মৃতদেহ আগুনে পোড়াইত না?

১০। হোমার কে? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১১। হোমারের যুগের গ্রীকদের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

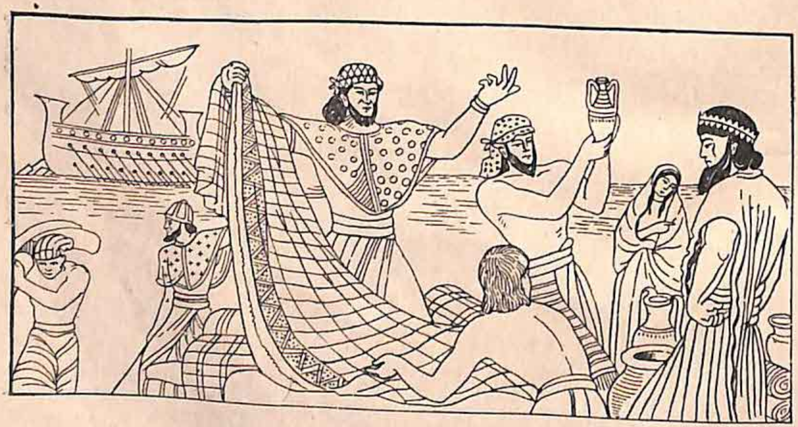
পঞ্চম অধ্যায়

ফিনিসীয় বণিক ও ইহুদী নবী

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা আর্যদের কথা বলিয়াছি। এইবার দুইটি অনার্য জাতির কথা বলিতেছি। ইহাদের নাম হইল ফিনিসীয় ও ইহুদী জাতি।

ফিনিসীয় বণিক—

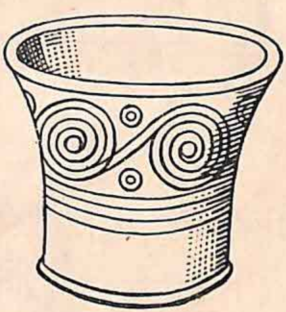
ফিনিসীয়রা বাস করিত এশিয়ার পশ্চিমে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে। তাহাদের প্রধান নগরের নাম ছিল টায়ার। বাণিজ্যই ছিল



ফিনিসীয় বণিক ও বাণিজ্য জাহাজ

তাহাদের জাতীয় বৃত্তি। তাহাদের কথা ভাবিলেই চোখে ভাসিয়া

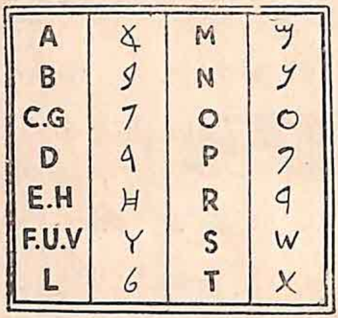
উঠে তাহাদের জাহাজের ছবি। এই সব জাহাজে না ছিল কল, না ছিল বাষ্পের ব্যবহার, না ছিল দিক্ স্থির করিবার যন্ত্র। কেমন করিয়া থাকিবে ? ইহাদের আবিষ্কার হইয়াছে অনেক, অনেক পরে। ফিনিসীয় জাহাজ চলিত দাঁড় ও পালের সাহায্যে। তারার অবস্থান দেখিয়া নাবিকগণ দিগ্‌নির্ণয় করিত। তবুও নির্ভয়ে এইসব জাহাজ 'কালাপানি' পার হইত। সোনা, রূপা, বহুমূল্য রত্ন, হাতির দাঁত, তামা, লোহা, শস্য, নানারকম কাপড়, আর ফিনিসীয়দের নিজেদের হাতে তৈয়ারি করা কাঁচ, কাপড়, চীনামাটির বাসন এবং একপ্রকার রং ইহারা বহন করিয়া লইয়া যাইত সুদূর গ্রীস, ইটালী, স্পেন, আফ্রিকা এমন কি ইংলণ্ড পর্যন্ত। দূরদেশের সহিত বাণিজ্য করিয়াই ফিনিসীয়রা ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বহু উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের প্রধান উপনিবেশ কার্থেজ একটি বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।



ফিনিসীয় পাত্র

ফিনিসীয়দের দোষের অভাব ছিল না। আমাদের দেশে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে পর্তুগীজ নামে ইউরোপের একজাতি বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। ফিনিসীয়রা ছিল অনেকটা পর্তুগীজদের মত। পর্তুগীজদের মতই তাহারা ছিল নির্মম। অপরকে বঞ্চনা করিতে তাহাদের দ্বিধা হইত না। জলপথে তাহারা ডাকাতি করিত, অসহায় মানুষ ধরিয়া তাহারা বিদেশে বিক্রয় করিত, অথবা তাহাদের জাহাজে মাল্লার কাজ করিতে বাধ্য করিত। কিন্তু তাহাদের গুণও ছিল অনেক।

তাহাদের সাহস ছিল অমিত, সংকল্প ছিল সুদৃঢ়, বুদ্ধি ছিল সুতীক্ষ্ণ, অজানার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ ছিল অপরাজেয়। তাহারা শিল্পের ও বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিল। তাহারা এশিয়ার সভ্যতা ইউরোপে বিস্তৃত করিয়াছিল। তাহাদের বর্ণমালা হইতে পৃথিবীর বহুদেশের বর্ণমালা জন্মলাভ করিয়াছে।



প্রাচীন ফিনিসীয় ও বর্তমান ইংরেজি লিপি

ইহুদী নবী—

ফিনিসীয়দের কথা বলিতে গেলেই বলিতে হয় তাহাদের বণিকদের কথা। সেইরূপ ইহুদীদের কথা মনে হইলেই মনে হয় তাহাদের নবীদের কথা। যে সকল মহাপুরুষ ভগবানের বাণী লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেন, তাহাদিগকে বলা হইত নবী। ইহুদীদের প্রাচীন কাহিনীতে অনেক নবীর উল্লেখ আছে। ইঁহারা যুগে যুগে আসিয়া ইহুদীগণকে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন এবং ধর্মের পথে চালিত করিয়াছেন।

ইহুদীদের দেশ ছিল পশ্চিম এশিয়ার প্যালেষ্টাইনে। কিন্তু এই দেশ হইতে তাড়িত হইয়া তাহাদিগকে অনেককাল মিশরে থাকিতে হয়। ফেরো কিন্তু তাহাদিগকে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না; ফলে তাহাদিগকে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। শেষে তাহাদের মধ্যে মোজেস নামে এক নবীর আবির্ভাব হয়। তিনি তাহাদিগকে

লইয়া মিশর ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাহাদের পলায়নের কথা জানিতে পারিয়া ফেরো সসৈন্যে তাহাদিগকে তাড়া করেন। প্রবাদ আছে ইহুদীরা লোহিত সাগরের নিকটে আসিলে ঐ সাগরের জল শুকাইয়া যায়। তখন তাহারা অনায়াসে হাঁটিয়া সাগর পার হয়। ফেরোর লোকেরা তাহাদের অনুসরণ করে। কিন্তু তাহারা সমুদ্রের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইলে, উহার ঢেউ গর্জন করিয়া তাহাদের উপর আসিয়া পড়ে এবং সকলকে ডুবাইয়া দেয়।

সাগর পার হইয়া মোজেস প্যালেষ্টাইনের দিকে রওনা হন। পথে তিনি এক পাহাড়ে ভগবানের বাণী শুনিতে পান এবং তাঁহার নিকট হইতে দশটি নির্দেশ লাভ করেন। এই সব নির্দেশের উদ্দেশ্য হইল ইহুদীগণকে আদর্শ মানুষ করিয়া তোলা। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল—সকল মন ও প্রাণ দিয়া ভগবানকে ভক্তি করা, প্রতিবেশিগণকে ভালবাসা, কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা এবং জীবন পবিত্র রাখা।



মোজেস

ভগবান ইহুদীগণকে কথা দিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে আবার প্যালেষ্টাইনে ফিরাইয়া আনিবেন। তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নয়। অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া ইহুদীরা শেষে স্বদেশে ফিরিয়া আসে।

প্যালেষ্টাইনে আসিয়া তাহারা একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে। এই রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি করেন ইহার দ্বিতীয় রাজা নবী ডেভিড। ডেভিডের জন্ম হইয়াছিল এক অখ্যাত পরিবারে। তিনি বাল্যকালে পিতার মেষ চরাইতেন। ঐ সময় সল ছিলেন ইহুদীদের রাজা। ডেভিড তাঁহার সৈন্যদলে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে যশস্বী হইয়া উঠেন।



ডেভিড

কথিত আছে, একবার সলের মাথা খারাপ হইয়াছিল। তিনি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়া একাকী থাকিতে আরম্ভ করেন। কাহারও সহিত কথাও বলিতেন না। ডেভিড বীণা বাজাইয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল ও সক্রিয় করিয়া তোলেন।

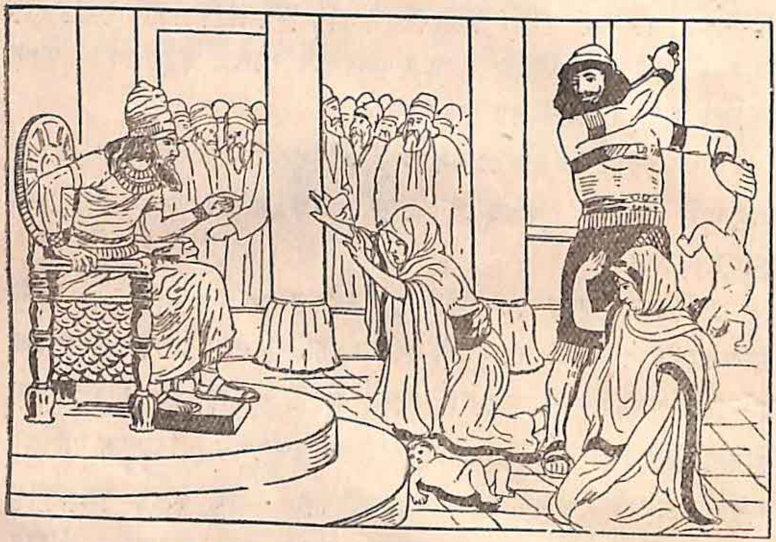
সলের সৈন্যদের সহিত একবার ফিলিষ্টাইনদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ডেভিড উহাদের প্রধান পালোয়ান গোলিয়াথকে নিহত করেন। এই কৃতিত্বের ফলে ডেভিডের প্রভাব এত বাড়িয়া যায় যে সল তাঁহাকে ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবারও আয়োজন করেন। ডেভিড রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং একটি গুহায় বাস করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে এক যুদ্ধে সলের মৃত্যু হয়। তখন ডেভিড আসিয়া ইহুদীদের রাজা হন।

রাজা হইয়া ডেভিড জেরুসালেম জয় করেন এবং উহাকে তাঁহার রাজধানী করেন। এইস্থানে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করিতেও আরম্ভ করেন।

ডেভিডের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নবী সলোমন রাজা হন। তিনি জেরুসালেমকে একটি মহানগরী করিয়া তোলেন এবং ডেভিডের আরব্ধ মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করেন। তিনি মিশর ও টায়ারের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার রাজ্যের প্রতিপত্তি বাড়াইয়া তোলেন। বিদেশে বাণিজ্য করিয়া তিনি অমিত ধনরত্নের অধিকারী হন। এই ধনের অপেক্ষাও বেশি ছিল তাঁহার সুনাম। তাঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ, তাঁহার বিচার ক্ষমতা ছিল নিরপেক্ষ এবং সুতীক্ষ্ণ।

এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। কাহিনীটি আমরা সংক্ষেপে বলিতেছি—এক সময় একই ঘরে দুইটি স্ত্রীলোকের দুইটি পুত্র হয়। কিন্তু রাত্রে উহাদের একটি মারা যায়। যাহার পুত্র মারা যায়, সে অন্য স্ত্রীলোকটির জীবিত পুত্রটিকে চুরি করিয়া আনে এবং নিজের মৃত পুত্রটি তাহার কোলে রাখিয়া আসে। স্ত্রীলোকটি ঐ সময় ঘুমাইতেছিল, সুতরাং কিছুই জানিতে পারে নাই। ঘুম হইতে উঠিয়া কোলে মৃত শিশুটি দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠে এবং বলিতে

থাকে তাহার পুত্র মরে নাই, উহাকে চুরি করিয়া লওয়া হইয়াছে। তখন ঐ দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয়। শেষে তাহারা সলোমনের বিচার প্রার্থনা করে।



সলোমনের বিচার

সলোমন আদেশ দেন—শিশুটিকে দুই ভাগ করিয়া উহাদের দুই জনকে দেওয়া হউক। তাঁহার এই রায় শুনিয়া একটি স্ত্রীলোক নীরব থাকে; অপরটি কিন্তু 'হায়', 'হায়' করিয়া উঠে। সে সলোমনের নিকট মিনতি জানায় শিশুটিকে যেন মারিয়া ফেলা না হয়, সে আর উহা দাবি করিবে না। তখন ঐ স্ত্রীলোকটিই যে শিশুর প্রকৃত মা, সকলে একথা বুঝিতে পারে। শিশুটি তাহাকেই ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অপর স্ত্রীলোকটি তাহার পাপের উচিত শাস্তি পায়।

ইহুদীদের এই সব প্রাচীন কাহিনী এবং তাহাদের ধর্মের অনেক কথা বাইবেলের প্রথম অংশে নিহিত রহিয়াছে। এই অংশের নাম 'প্রাচীন অবদান' ('ওল্ড টেষ্টামেণ্ট')। ইহুদীরা অতি ধর্মপ্রিয়। তাহারা বিশ্বাস করিত ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। তাহারা মূর্তি পূজা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিত না। তাহাদের ধারণা ছিল অন্য সকল জাতি হইতে তাহারা পৃথক।

কালক্রমে ইহুদীরা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে এবং পৃথিবীর বহুদেশে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তবুও তাহারা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ভোলে নাই। এখনও তাহারা অনুসরণ করে তাহাদের ধর্ম এবং প্রাচীন রীতিনীতি।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ	খ্রীঃ পূঃ
আনুমানিক ৩,০০০-২,০০০ ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফিনিসীয়দের উপনিবেশ স্থাপন	১,২৫০ মোজেস্
৮০০ কার্থেজের প্রতিষ্ঠা	১,০০০ ডেভিড্
	৭২০ ইহুদি রাজ্যের পতন

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ফিনিসীয়রা কোন্ কোন্ দেশের সহিত বাণিজ্য করিত?

২। ফিনিসীয় জাহাজগুলি কোন্ কোন্ পণ্য বিদেশে লইয়া যাইত?

৩। কি কারণে ফিনিসীয়গণকে পর্তুগীজদের সহিত তুলনা করা হয়?

৪। ফিনিসীয়গণ মানুষের কি কি উপকার সাধন করে?

৫। কাহাদিগকে নবী বলা হয়? কয়েকজন নবীর নাম কর, নবীরা ইহুদীদের কি উপকার করিয়াছে।

৬। ইহুদীরা কি কারণে মিশর দেশ ছাড়িয়া আসে? আসিবার সময় তাহাদিগকে কি কি বিপদে পড়িতে হয়? কিরূপে তাহারা ঐ সব বিপদ অতিক্রম করে?

৭। মোজেস ভগবানের নিকট হইতে যে সকল নির্দেশ লাভ করেন, তাহাদের সারমর্ম কি?

৮। ডেভিডের জীবনকথা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

৯। সলোমন ইহুদীদের কি উপকার সাধন করেন?

১০। 'প্রাচীন অবদান' কাহাকে বলে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র

এথেন্‌স ও স্পার্টার নাগরিক জীবন

হোমারের যুগের গ্রীসের কথা বলিয়াছি ; এখন পরবর্তী সময়ের কথা বলিতেছি। কিন্তু এই কথা শুনিবার আগে গ্রীস দেশটা কিরূপ তাহা একটু জানিয়া রাখা ভাল।

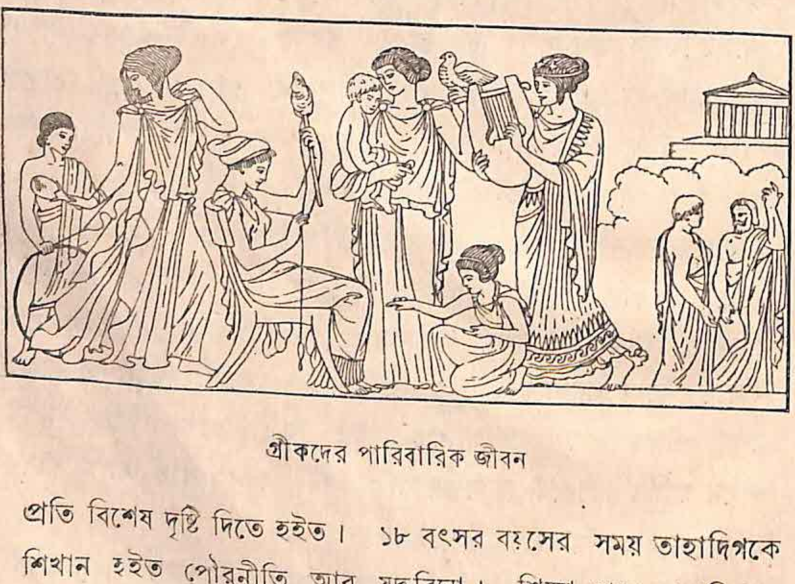
গ্রীস পাহাড়ের দেশ। এখানে ওখানে প্রায় সবখানেই পাহাড়, মাঝে মাঝে শুধু সংকীর্ণ উপত্যকা। এই উপত্যকা হইতে অন্য উপত্যকায় যাওয়ার অসুবিধা ছিল অনেক ; কারণ সে যুগে ট্রেন, মোটর কিছুই ছিল না। এই কারণে এক অঞ্চলের লোকের সহিত অন্য অঞ্চলের লোকের খুব কমই দেখাশোনা হইত। ফলে, গ্রীসে গড়িয়া উঠে কতকগুলি শুধু স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নগর-রাষ্ট্র। এই সব রাষ্ট্রগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া একটি জাতীয় রাষ্ট্র তৈয়ারি করা সম্ভবপর হয় নাই। মাঝে মাঝে অবশ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি স্থায়ী হয় নাই, তুদিন পরে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রীসের ইতিহাস প্রধানতঃ ঐসব নগর-রাষ্ট্রেরই ইতিহাস। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থিব্‌স প্রভৃতি। সকল নগর একরূপে শাসিত হইত না। কোন কোন নগর শাসন করিত ইহাদের অধিবাসীরা ; আর কোন কোন নগর শাসন করিতেন রাজা, প্রজাদের ইচ্ছানুসারে।

এইবার আমরা এইসব নগরের লোকেরা কিভাবে জীবন যাপন করিত সেই কথা বলিতেছি। এথেন্স ও স্পার্টার অধিবাসীদের কথা বলিলেই এ বিষয়ে তোমাদের মোটামুটি ধারণা হইবে।

এথেন্‌সের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা—

এথেন্‌সের অধিবাসীরা বহু বড় কাজ করিয়াছে। তবুও তাহারা বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়াছে তাহাদের সভ্যতার জন্য। এই সভ্যতার মূলে ছিল তাহাদের শিক্ষা। সরকার শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন না। যাঁহারা অধ্যাপনাকে বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই বিদ্যালয় খুলিতেন এবং ঐগুলি পরিচালিত করিতেন।

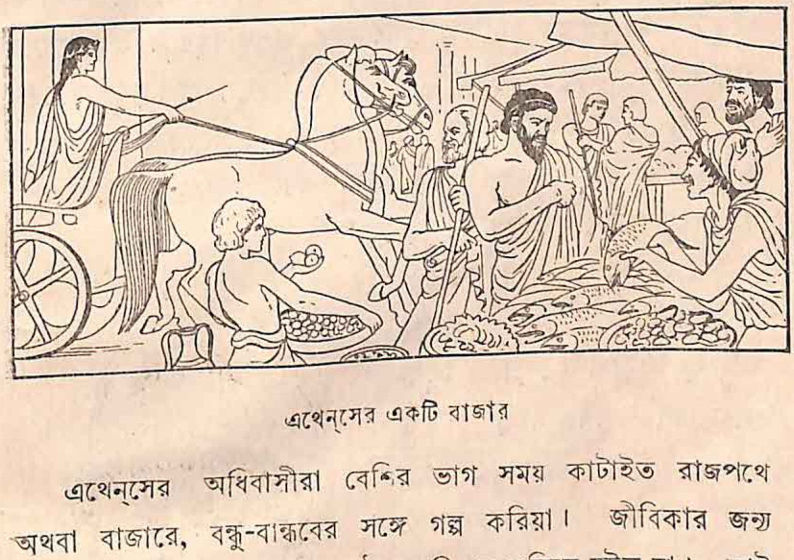
ছেলেরা শৈশবেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইত। তাহাদিগকে ইতিহাস পড়িতে হইত, গান শিখিতে হইত, ব্যায়াম করিতে হইত, পরে ছবি আঁকিতেও শিখিত। ১৬ বৎসর বয়সের সময় তাহাদিগকে ব্যায়ামের



গ্রীকদের পারিবারিক জীবন

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইত। ১৮ বৎসর বয়সের সময় তাহাদিগকে শিখান হইত পৌরনীতি আর যুদ্ধবিদ্যা। শিক্ষা শেষে তাহাদিগকে পাঠান হইত রাষ্ট্র রক্ষার কাজে, বিভিন্ন সীমান্তের সেনানিবাসে। ২০ বৎসর বয়সে তাহারা নাগরিকের সমস্ত অধিকার লাভ করিত।

মেয়েরা শিক্ষা লাভ করিত বাড়িতে। তাহাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল তাহাদিগকে ঘরকন্নার কাজে যোগ্য করিয়া তোলা। অবশ্য তাহারা লিখিতে পড়িতেও শিখিত। ইহাদের সঙ্গে তাহাদিগকে শিখিতে হইত চর্‌কা কাটিতে, কাপড় বুনিতে, সূচীর কাজ করিতে ও গানবাজনা করিতে।



এথেন্সের একটি বাজার

এথেন্সের অধিবাসীরা বেশির ভাগ সময় কাটাইত রাজপথে অথবা বাজারে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করিয়া। জীবিকার জন্য আমাদের মত তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত না। তাই তাহাদের অবসরের মোটেই অভাব হইত না। অবশ্য তাহাদিগকে জনসভায় যোগ দিতে হইত, সরকারী বিচারকার্যেও অংশ লইতে হইত। কিন্তু এই সব কাজ তাহারা করিত প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে। সুতরাং পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার তাহাদের প্রচুর সুযোগ ছিল। এই সুযোগের ফলে তাহাদের সংস্কৃতির উন্নতি হইত, প্রসারও হইত।

স্পার্টার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা—

এথেন্সের তুলনায় স্পার্টার অধিবাসীদের জীবন ছিল কঠোরতর। প্রবাদ আছে, তাহাদের রাষ্ট্রে লাইকারগাস নামে এক রাজা ছিলেন। লাইকারগাসের ইচ্ছা ছিল তাহাদিগকে পূরাপূরিভাবে সৈনিক করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি নিয়ম করেন। এই সব নিয়ম অনুসারে স্পার্টার অধিবাসিগণকে চলিতে হইত। ঐ নগরের ছেলেরা মাত্র সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহাদের পিতামাতার কাছে থাকিতে পারিত। তারপর সরকার ভার লইতেন তাহাদের দেহ ও মন গড়িয়া তুলিবার। এই ব্যবস্থার ফলে স্পার্টা অপরাজেয় সৈনিকে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং দক্ষিণ গ্রীসের প্রায় সব জায়গায় তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়।

স্পার্টার উদ্দেশ্য ছিল তাহার অধিবাসীদিগকে শুধু বাহুবলে বলীয়ান করিয়া তোলা। কিন্তু এথেন্সের শিক্ষানীতি ছিল উদারতর। নাগরিকগণের একই সঙ্গে দেহ ও মন বিকশিত করাই ছিল তাহার লক্ষ্য। তাই গ্রীক সভ্যতায় যে কোন নগর অপেক্ষা এথেন্সের অবদান অনেক বেশি। এই অবদান পরিপূর্ণ গৌরবলাভ করে পেরিক্লিসের যুগে।



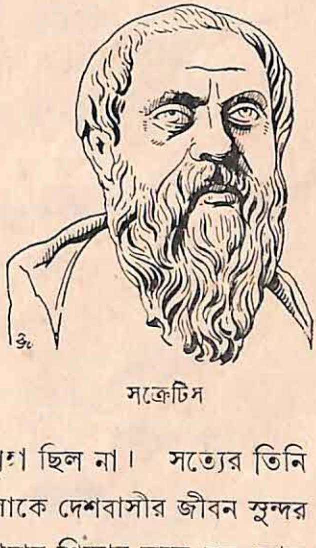
পেরিক্লিস

প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া পেরিক্লিস ছিলেন এথেন্সের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল নেতা। প্রায়

১৫ বৎসর কাল তিনি ছিলেন ঐ রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাঁহার প্রেরণায় এথেন্‌স জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে গ্রীসের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠে। এই সময় বহু জ্ঞানীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল।

সক্রেটিস ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে সুনিপুণ শিল্পী, নির্ভীক সৈনিক ও নিরপেক্ষ বিচারক।

"হও করমেতে বীর, হও ধরমেতে ধীর
হও উন্নত শির, নাহি ভয়"—


সক্রেটিস

এই আদর্শ ও আশ্বাস তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। দুঃখে তিনি উদ্বিগ্ন হইতেন না, সুখে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। সত্যের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পূজারী। ইহার আলোকে দেশবাসীর জীবন সুন্দর করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার ব্রত। তাঁহার শিক্ষার ফলে বহু লোক কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে চলিতে আরম্ভ করে। সক্রেটিসের উদার আদর্শ কিন্তু সকলে পছন্দ করিত না। ইহারা অভিযোগ করে যে তিনি ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং যুবকগণকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন।

বিচারের সময় একটু নতি স্বীকার করিলেই সক্রেটিস অব্যাহতি পাইতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ করিলেন না, বরং অচঞ্চল দৃঢ়তার সহিত নিজ পক্ষ সমর্থন করিলেন; ফলে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের

তাঁহার প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী হন। এই জয় হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি কতবড় নাট্যকার ছিলেন।

ইউরিপিডিস রচনা করেন প্রায় ৯০ খানা নাটক। ইহার মধ্যে পাওয়া যায় মাত্র ১৯ খানা। তাঁহার পূর্বে গ্রীক নাটকে থাকিত শুধু আদর্শ বীরদের কথা। ইউরিপিডিস সাধারণ লোকের সুখ, দুঃখ লইয়া তাঁহার নাটক রচনা করেন। যাহারা হতভাগ্য, যাহারা ভিক্ষা করিয়া দিন কাটায়, যাহারা ক্রীতদাস, ইউরিপিডিস তাহাদিগকেও উপেক্ষা করেন নাই। ধর্ম বিষয়েও তাঁহার মত ছিল অতি উদার; ফলে তিনি বহু লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে হয় নাই, তিনি আপনিই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান।

এরিষ্টোফেনিস ৪০ খানি নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে মাত্র ১১ খানি পাওয়া যায়। তাঁহার নাটকগুলি কৌতুক ও বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা কিছু তিনি অকল্যাণকর মনে করিতেন, সেই সবই হইত এই বিদ্রূপের বিষয়। কিন্তু এই বিদ্রূপ বর্ষিত হইত এত সুন্দর ভাবে যে তাঁহার রচনা হইয়া উঠিত উচ্চস্তরের সাহিত্য।


হেরোডোটাস

গ্রীসের দুইজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরও আবির্ভাব হইয়াছিল পেরিক্লিসের যুগে। ইহারা হইলেন হেরোডোটাস ও থুসিডিডিজ। এক সময় পারসিকদের সহিত গ্রীসের ভীষণ যুদ্ধ হয়। হেরোডোটাসের ইতিহাসে এই যুদ্ধের এবং আরও অনেক প্রাচীনতর বিষয়ের কথা জানা যায়। পুরাণ কাহিনী সংগ্রহ করিয়াই হেরোডোটাস্

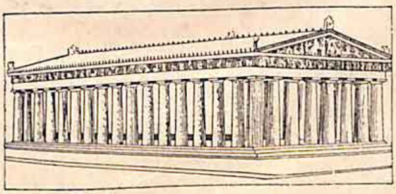
ক্ষান্ত হন নাই। বিভিন্ন জাতির সভ্যতার কথা জানিবারও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

থুসিডিডিজ্ ছিলেন এথেন্সের একজন সেনানায়ক। তাঁহার সময় এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তিনি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ পরিচালনায় নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই, ফলে তাঁহাকে নির্বাসনে যাইতে হয়। নির্বাসনে বসিয়া তিনি ঐ যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন এবং উহাকে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ করিতে চেষ্টা করেন। প্রায় চব্বিশ শত বৎসর পূর্বে এই দুই মনীষীর মৃত্যু হয়। কিন্তু আজিও ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের নাম পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন।



থুসিডিডিজ্

ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও পেরিক্লিসের যুগ অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে। এই কীর্তির জন্য এথেনীয়গণ বিশেষ ভাবে প্র্যাক্সিটেলিস ও ফিডিয়েসের নিকট ঋণী। প্র্যাক্সিটেলিস্ বহু দেবমূর্তি নির্মাণ করেন। ফিডিয়েসের পরিচালনায় নির্মিত হয় এ্যাথিনার ভুবনবিখ্যাত মন্দির **পার্থেনন**। এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল এথেন্সে। ইহাকে ঘিরিয়াছিল ৪৬টি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভ প্রায় ৩৫ ফিট্ উচ্চ। মন্দিরের মধ্যে ছিল এ্যাথিনা



পার্থেনন

দেবীর বিরাট মূর্তি। এই মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল হাতির দাঁত ও সোনার সাহায্যে। বহুযুগ ধরিয়া পার্থেনন ছিল এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় এবং সভ্য জগতের সৌন্দর্যপ্রিয় সকল লোকের তীর্থ।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ৮৮৪ লাইকারগাস্

৪৬১-৪২৯ পেরিক্লিসের যুগ

৩৯৯ সক্রেটিসের মৃত্যু

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গ্রীসে কেন একটি জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই ?

২। এথেন্সের শিক্ষা-নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। এথেন্স্ অপেক্ষা স্পার্টার জীবনযাত্রা কঠোরতর ছিল এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে ?

৪। স্পার্টার শিক্ষা-নীতির কি লক্ষ্য ছিল ? ঐ লক্ষ্য কতদূর সফল হইয়াছিল ?

৫। পেরিক্লিস কে ? তিনি এথেন্সের কি কি উপকার করেন ?

৬। পেরিক্লিসের যুগে এথেনীয় সভ্যতা চরম গৌরব লাভ করে,—এই কথার সত্যতা যাচাই কর।

Half yearly

সপ্তম অধ্যায়

পারসিক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও গ্রীস বিজয়ের প্রয়াস

"কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদ র্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।"

আমরা পূর্বে আসিরীয়দের কথা বলিয়াছি। একদিন তাহারাও ছুটিয়া চলিয়াছিল দূর দূরান্তরে। দেশবিদেশের আকাশে উড়িয়াছিল তাহাদের জয়ের নিশান। আবার আর একদিন মিডিয়দের নির্মম আঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল তাহাদের সাম্রাজ্য, ভগ্নস্ত‌‌ূপ হইয়াছিল তাহাদের রাজধানী।

মিডিয়দের কথা—

এই মিডিয়দের কথা কিন্তু আমরা বিশেষ কিছুই জানিনা। এইমাত্র জানি তাহারা আসিয়াছিল ইরাণ হইতে। তাহারা আর্যদেরই একটি ভাষা ব্যবহার করিত। ইরাণ দেশের অধিবাসিগণকে তাহারা উপহার দিয়াছিল তাহাদের ভাষা, বর্ণমালা আর চামড়ার কাগজ ও কলম ব্যবহার করিবার শিক্ষা।

উল্কার মত মিডিয় সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হয়, আবার উল্কার মতই উগ্র বিলীন হইয়া যায়। ইহার পরিবর্তে দেখা দেয় তাহাদের জ্ঞাতি পারসিকদের সাম্রাজ্য।

পারসিক সাম্রাজ্যের আবির্ভাব—

পারসিক নরপতি সাইরাস মিডিয়গণকে বশে আনেন। ইহার পর তিনি বেবিলন জয় করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু

অংশও তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীন হয়। তাঁহার পুত্র ক্যাম্বাইসিস মিশর জয় করিয়া এই সাম্রাজ্যের সীমা আরও বাড়াইয়া তোলেন।



সম্রাট দারায়ুস

মহারাজ দারায়ুসের শাসনকালে পারসিক সাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাঁহার বিজয় রথ রাশিয়ার ভল্গা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। নৌবাহিনী তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠা করে সিন্ধু নদীর তীরে, রাজপুতানার মরুপ্রান্তে। প্রতি বৎসর ভারতীয় প্রদেশ হইতে তাঁহার ভাণ্ডারে আসিত রাশি রাশি স্বর্ণ রেণুর কর।

বিশাল সাম্রাজ্য এবং অমিত সম্পদের অধিকারী হওয়ায় দারায়ুসের মন গর্বে ভরিয়া উঠে। এই গর্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার একখানি শিলালিপিতে। শিলালিপিটি পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন বহিস্তুনের পাহাড়-চূড়ায়। ইহাতে লিখিত রহিয়াছে তাঁহার দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী, আর বিজিত দেশসমূহের তালিকা। শিলালিপির উপরে দেখিতে পাওয়া যায়, পরাজিত শত্রুকে পদদলিত করিয়া সম্রাট দাঁড়াইয়া আছেন সুদীপ্ত মহিমায়।

গ্রীসের সহিত সংঘর্ষ—

মানুষের কামনার শেষ নাই। দারায়ুসের বেলাও তাহাই হইল। জীবনের শেষ দিকে তাঁহার ইচ্ছা হইল নূতন দেশ জয় করিবার। এই দেশটি আমাদের পরিচিত গ্রীস। কথিত আছে, মহারাণীর কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া তিনি এই সংকল্প গ্রহণ করেন।

সম্রাট বশ্যতার দাবি জানাইয়া বিভিন্ন গ্রীকরাষ্ট্রে দূত পাঠাইলেন। নিয়ম ছিল যাহারা এই বশ্যতা স্বীকার করিবে তাহাদিগকে জল ও মাটি উপহার দিতে হইবে। পারসিকদের শক্তির কথা জানিয়া অনেকেই ভীত হইল। আরেকটি ঘটনার ফলে তাহাদের ভয় আরও বাড়িয়া গেল। ডেলস দ্বীপে সূর্যদেবের একটি মন্দির ছিল। গ্রীকরা বিশ্বাস করিত ঐ মন্দিরে ধর্না দিলে দেবতার ইচ্ছা জানা যায়। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। গুজব রটিল ঐ মন্দিরে দৈববাণী হইয়াছে, পারসিকদের সহিত সংঘর্ষের ফলে গ্রীকদের অনুকূল হইবে না। ফলে, বহু রাষ্ট্রই পারসিকদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জল ও মাটি উপহার দিল। দিলনা শুধু এথেন্স্ আর স্পার্টা। পারসিকদের দূত এথেন্সে আসিলে তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল। তারপর তাহাকে কবর দিয়া বলা হইল, যত খুশি মাটি লইয়া যাও। যে দূত স্পার্টায় গেল তাহাকে একটি কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল, বলা হইল ওখান হইতে যত খুশি জল লইয়া যাও। এই সংবাদ শুনিয়া দারায়ুস ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন এই ধৃষ্টতার তিনি কঠোর শাস্তি দিবেন।

ম্যারাথনের যুদ্ধ—

সম্রাটের সঙ্কল্প সফল করিবার উদ্দেশ্যে অগণিত সৈন্য গ্রীসের অভিমুখে রওনা হয়। তাহাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইল এথেন্স্। তাহারা ম্যারাথনের প্রান্তরে আসিয়া ছাউনি ফেলে ; আর অল্প কয়েক মাইল গেলেই এথেন্স্। এই অল্প কয়েক মাইল কিন্তু পার হওয়া সম্ভব হইল না।

পাহাড় হইতে তাহাদের উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল মিল্টাইএডিসের পরিচালনায় এথেনীয় সৈন্য। সংখ্যায় তাহারা

শত্রুদের অর্ধেক, কিন্তু সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় তাহারা একজন দশজন শত্রুর সমান। তাহাদের ব্রত রাজ্য জয় নয়, স্বর্গ হইতেও গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা।

উভয় পক্ষের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিল। পারসিকদের ধনুক হইতে বর্ষাধারার ন্যায় রাশি রাশি তীর গ্রীকদের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের লোহার শিরস্ত্রাণ আর লোহার বর্মে ঠেকিয়া তীরগুলি বিফল হইয়া গেল। অবশেষে পারসিকগণ পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল। বিজয়গর্বে এথেনীয়গণ ফিরিয়া চলিল তাহাদের রাজধানী অভিমুখে। রাজধানীতে আসিয়া যে দৃশ্য তাহাদের চোখে পড়িল তাহাতে তাহাদের আনন্দ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত পরে ঐ আনন্দ হইয়া উঠিল আরও উজ্জ্বল।

একটি যুবকের প্রাণহীন দেহ তাহাদের চোখে পড়িল। এই যুবকটির উপর এথেন্সে জয়ের সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এক নিঃশ্বাসে সে ছুটিয়া আসে। সংবাদ পৌঁছাইয়া কিন্তু সে মাটিতে পড়িয়া যায়, আর উঠেনা।

তাহার এই আত্মভোলা দেশপ্রীতি নিশ্চয়ই সেদিন এথেনীয়গণের মন গর্বে ভরিয়া দিয়াছিল। পরবর্তীকালে ইহারই স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয় ম্যারাথন রেস (একটি দৌড়ের প্রতিযোগিতা)। এই প্রতিযোগিতার পথ হইল ২৬ মাইল, ৩৮৫ গজ দীর্ঘ। ম্যারাথনের যুদ্ধে হারিয়াও দারায়ুস গ্রীস জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া গেল। আর এক অভিযান পাঠাইবার উদ্দেশ্যে তিনি বিপুলতর আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইল।

দারায়ুসের মৃত্যুতেও কিন্তু গ্রীকরা রেহাই পাইল না। ম্যারাথনের যুদ্ধের ১০ বৎসর পরে আবার তাহাদিগকে পারসিক আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়। দারায়ুসের পুত্র জার্কসিজ্ ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যের অপর সকল অংশ হইতে সৈন্য আনাইয়া একটি বাহিনী গঠন করিলেন। এই বাহিনী যেমনই বিশাল, তেমনিই বিপুল ইহার অস্ত্রসজ্জা। সকলের মনে হইল, ইহাকে কেহই পরাজিত করিতে পারিবে না। এই বাহিনী লইয়া জার্কসিজ্ গ্রীসের অভিমুখে রওনা হইলেন।

স্থলপথে গ্রীসে যাইতে হইলে একটি প্রণালী পার হইতে হয়। ইহার নাম ডারডানেলস প্রণালী। নৌকার সহিত নৌকা বাঁধিয়া ইহার উপরে একটি পুলের মত তৈয়ারি করা হইল। এই পুলের উপর দিয়া পারসিকরা প্রণালী পার হইয়া গেল। কথিত আছে, নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপরে একখানা মর্মর সিংহাসন বসান হইয়াছিল। উহার উপরে বসিয়া জার্কসিজ্ সৈন্য পারাপার দেখিয়াছিলেন।

থার্মোপাইলির যুদ্ধ—

পারসিক সৈন্যগণ সদর্পে গ্রীসের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। গ্রীসের পূর্বপ্রান্তে আসিয়া কিন্তু তাহাদিগকে থামিতে হইল। এই জায়গায় একটি দুর্গম গিরিপথ আছে। এই গিরিপথের নাম থার্মোপাইলির গিরিপথ। পারসিকেরা দেখিল, থার্মোপাইলির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন স্পার্টার রাজা লিওনিডাস, মাত্র সাত হাজার সৈন্য লইয়া। প্রথমে তাহাদের বড় হাসি পাইল। এত অল্প লোক যে তাহাদিগকে বাধা দিতে সাহস করিবে, তাহারা একথা ভাবিতেও পারিল না। কিন্তু তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে দেরি হইল না। এই ছোট দলটি দুইদিন ধরিয়া তাহাদের সকল আক্রমণই ব্যর্থ করিয়া দিল। বার বার গিরিপথ পার হইতে গিয়া তাহাদিগকে শত শত সৈন্য হারাইতে

হইল। শেষে তাহারা অন্য পথের সন্ধান করিতে বাধ্য হইল। এক বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে তাহারা ঐরূপ একটি পথের সন্ধান পাইল এবং উহার সাহায্যে বহু সৈন্য থার্মোপাইলির অপর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল।

লিওনিডাস দেখিলেন তাঁহার সামনে, পিছনে, দুইদিকেই শত্রু। তবুও তিনি ভয় পাইলেন না। অধিকাংশ সৈন্য তিনি সরাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনশত সৈন্য কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। ইহাদিগকে লইয়া লিওনিডাস মহা বিক্রমে শত্রুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং অজস্র শত্রু নিহত করিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে এই সব শহীদদের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর সমাধিলিপি রচিত হয়। উহার মর্ম এইরূপ—

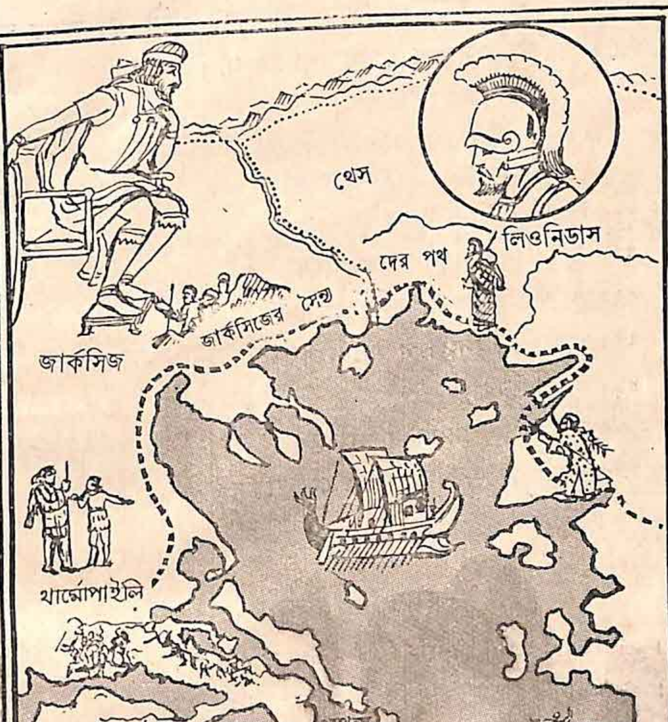
"হে পথিক জানাইও আমাদের দেশে
মৃত্যুরে বরিণু হেথা তাহার আদেশে।"

লিওনিডাস ও তাঁহার সঙ্গীদের আত্মদান নিষ্ফল হয় নাই। ইহার ফলে দেশে ও বিদেশে স্বাধীনতার সৈনিকেরা লাভ করিয়াছে স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগের অজেয় সংকল্প। তাই লিওনিডাস ও তাঁহার সঙ্গীরা এখনো প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের কথা মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের মহাবাণী—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।"

থার্মোপাইলির গিরিপথ অতিক্রম করিয়া পারসিকেরা গ্রীসের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের সকল দর্প চূর্ণ হইয়া যায়। স্যালামিসের যুদ্ধে তাহাদের নৌবাহিনী এবং প্লেটিনার যুদ্ধে তাহাদের

স্থলবাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পরেও প্রায় দেড়শত বৎসর পর্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য টিঁকিয়া থাকে। কিন্তু গ্রীসদেশ জয় করা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই।



পারসিকদের পরাজয়ের ফলে গ্রীসের স্বাধীনতা নিরাপদ হয় এবং ইহার অধিবাসীরা বিশেষতঃ এথেনীয়গণ বিপুল আত্মবিশ্বাস লাভ করে। এই আত্মবিশ্বাসের প্রেরণায় এথেনীয়গণ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অসাধারণ উন্নতি লাভ করে। ফলে তাহাদের রাষ্ট্রে যে যুগের সূচনা হয়, উহাকে স্বর্ণযুগ বলিলেও বেশি বলা হয় না।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ৬১২ মিডিয় সাম্রাজ্য স্থাপন
৫৫৮ সাইরাসের সিংহাসন আরোহণ
৫২৯ ক্যাম্বাইসিসের সিংহাসন আরোহণ
৫২২ দারায়ুসের সিংহাসন আরোহণ
৪৯০ ম্যারাথনের যুদ্ধ
৪৮৬ জার্কসিজের সিংহাসন আরোহণ
৪৮০ থার্মোপাইলি, স্যালামিস ও প্লেটিয়ার যুদ্ধ

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মিডিয়রা ইরাণ দেশকে কি কি উপহার দেয়?
২। সাইরাস কে? তিনি কি কারণে যশস্বী হইয়াছেন?
৩। দারায়ুস কতদূর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন?
৪। ম্যারাথনের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৫। ম্যারাথন রেস্ কাহাকে বলে?
৬। থার্মোপাইলি কোথায়? এই স্থানটি কেন স্মরণীয়?
৭। লিওনিডাস কে? কি কারণে তিনি আমাদের শ্রদ্ধার অধিকারী?

অষ্টম অধ্যায়

মহাবীর ও বুদ্ধদেব

ভারতবর্ষে আসিয়া আর্যেরা যে ধর্মের অনুসরণ করিত পূর্বেই আমরা তাহার কথা বলিয়াছি। কালক্রমে এই ধর্মের আদর্শ নিষ্প্রভ হয়। ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে অনুষ্ঠানের আড়ম্বর। যজ্ঞের নিয়ম-কানুন ক্রমেই জটিল হইয়া উঠে। ধর্ম হইতে আন্তরিকতা চলিয়া যায়। ফলে ইহাকে সরল ও পবিত্র করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই প্রয়োজন অনুভব করেন বিশেষ করিয়া দুইজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার। ইঁহারা হইলেন মহাবীর ও বুদ্ধদেব।

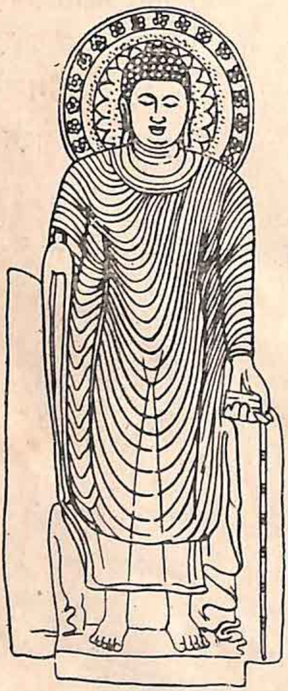


মহাবীর

মহাবীর—মহাবীরের জন্ম হয় বিহারে বুদ্ধের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে। তিনি তিরিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। বার বৎসর কঠোর তপস্যার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন এবং একটি নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। ভারতবর্ষে এই ধর্মের এখনও প্রভাব আছে। জৈন ধর্মের মূলনীতি হইল—কোন জীবকে হিংসা না করা, সর্বদা সত্য কথা বলা এবং জীবন পবিত্র

রাখা। মহাবীর প্রায় তিরিশ বৎসর ধরিয়া এই ধর্ম প্রচার করেন। ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হয়।

বুদ্ধদেব—প্রথম জীবনে বুদ্ধদেবের নাম ছিল সিদ্ধার্থ বা গৌতম। তাঁহার জন্ম হয় শাক্য বংশে, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কপিলবস্তু নগরে আমাদের সময় হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন কপিলবস্তুর একজন প্রধান নায়ক। সুতরাং গৌতমের ধনদৌলত কিছুরই অভাব ছিল না। ইহাদের প্রতি কিন্তু তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। শৈশব হইতেই তাঁহার মন ছিল বৈরাগ্যপ্রবণ। এই বৈরাগ্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে শুদ্ধোদন তাঁহাকে সুখ ও সম্ভোগে ঘিরিয়া রাখিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সিদ্ধার্থ বুঝিলেন মানুষের যৌবন চিরকাল থাকে না। জরা ইহাকে ম্লান করে, ব্যাধি ইহাকে বিকৃত করে, মৃত্যু ইহাকে ধ্বংস করে; সুতরাং মানুষের জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ দূর করিবার উপায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, ইনি পথের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি সংকল্প করিলেন, তিনিও সন্ন্যাসী হইয়া দুঃখ জয়ের পথ খুজিয়া বাহির



বুদ্ধদেব

করিবেন। একদিন গভীর রাত্রে রাজ্য, ধন, মান, স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর বহু বৎসর ধরিয়া তিনি শাস্ত্রপাঠ করিলেন; কঠোর তপস্যা করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া পাঁচজন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য হইলেন। তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, সিদ্ধার্থ কিন্তু তৃপ্ত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, তিনি এখনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তপস্যায় দেহ ক্ষীণ করিয়া জ্ঞান লাভের পথকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছেন; সুতরাং জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাঁহার শরীর সুস্থ করিতে হইবে। এই সময় এক পশুপালকের কন্যা তাঁহাকে মিষ্টান্ন উপহার দেয়। এই মেয়েটির নাম সুজাতা।

সিদ্ধার্থ সুজাতার পায়স গ্রহণ করিয়া সুস্থ হন। তাহার পর নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। ধ্যান করিতে করিতে তিনি অনুভব করিলেন যে, দুঃখ জয়ের পথ তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই পরম জ্ঞানের নাম বোধি। বোধি লাভ করিয়া সিদ্ধার্থর নাম হইল বুদ্ধ, আর তাঁহার প্রচারিত ধর্মের নাম হইল বৌদ্ধধর্ম। এখন হইতে এই ধর্ম প্রচার করাই হইল তাঁহার ব্রত। তাঁহার পূর্বের পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধ কিন্তু তাঁহাদিগকে ভোলেন নাই। বারানসীর অন্তর্গত মৃগদাবে গিয়া তিনি প্রথমে তাঁহাদিগকে তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত করেন।

তাহার পর বহু বৎসর ধরিয়া রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী কপিলবস্তু প্রভৃতি নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি ঐ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। বণিকশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডদ তাঁহার প্রেরণায় সর্বত্যাগী হন।

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণ নামে দুইজন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকদের ধর্মে অধিকার আছে একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বহু লোকও তাঁহার করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন আনন্দ ও উপালী। উপালী জাতিতে ছিলেন নাপিত। এইরূপে অসংখ্য লোককে নবজীবনের সন্ধান দিয়া বিরাশী বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব হিমালয়ের নিকটবর্তী কুশী নগরে মহানির্বাণ লাভ করেন।

বুদ্ধবাণী—বুদ্ধ বিশ্বাস করিতেন দুঃখ জয় করিতে হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সুখভোগে নিরত থাকিলে অথবা কঠোর তপস্যা করিলে এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। উভয়ের মধ্যবর্তী পথই হইল জ্ঞান লাভের পথ। এই পথে চলিতে হইল সকল বিষয়ে সৎ হইতে হইবে। মাতা যেমন করিয়া আপনার সন্তানকে ভালবাসেন ঠিক সেই ভাবে সকল প্রাণীকে ভালবাসিতে হইবে। অন্যায়কারীকেও ক্ষমা করিয়া তাহার মন কোমল করিয়া তুলিতে হইবে। সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণাই ছিল তাঁহার ধর্মের প্রধান কথা।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেব পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আজিও ম্লান হয় নাই। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম পৃথিবীর অনেক জায়গায় এখনও বহুলোক অনুসরণ করিয়া থাকে। এখনও তিনি সকলের নিকট করুণার আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপুরুষও তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন।—

"শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য"।

বুদ্ধের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ একসঙ্গে বাস করিয়া তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের এই সহবাসের ফলে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহার নাম 'বৌদ্ধ সংঘ'।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহে সমবেত হন এবং তাঁহাদের গুরুর বাণী সংগ্রহ করেন। এই সকল বাণী তিনখানি গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। ইহাদের একত্রে নাম হইতেছে ত্রিপিটক।

বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে শাক্যবংশে জন্মিবার পূর্বে, বুদ্ধ আরও অনেকবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সব জন্মের কথা লইয়া অনেক উপাখ্যান রচিত হয়। ইহাদের নাম জাতক।

ঘটনাপঞ্জী

আঃ খ্রীঃ পূঃ ৫৬৮ বুদ্ধের জন্ম
৪৮৬ বুদ্ধের পরিনির্বাণ

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মহাবীর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় বৈদিক ধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। মহাবীরের জীবনকথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। জৈন ধর্ম কে প্রতিষ্ঠা করেন? ঐ ধর্মের মূল কথা কি?

৪। বুদ্ধ কে? তাঁহার আদি নাম কি ছিল? কি কারণে তাঁহার নাম বুদ্ধ হয়?

৫। বুদ্ধ কি ভাবে তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন?

৬। বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা কি?

৭। সংঘ কাহাকে বলে?

৮। ত্রিপিটক বলিতে কি বুঝায়?

৯। জাতক বলিতে কি বুঝায়?

নবম অধ্যায়

কনফিউসিয়াস

পূর্বের অধ্যায়ে বুদ্ধের কথা বলিয়াছি। এইবার চীন দেশের এক মহাপুরুষের কথা বলিতেছি। ইঁহার নাম কনফিউসিয়াস।

কনফিউসিয়াসের জন্ম হয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। কিন্তু এই পরিবারটির অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং অভাবের



মধ্যে কনফিউসিয়াসের জীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে

তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। ছেলেবেলা হইতেই কনফিউসিয়াসকে পরিবারের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। ইহার উপর আবার তাঁহাকে শিখিতে হইত তীর ছুঁড়িতে আর গান গাহিতে।

বড় হইয়া কনফিউসিয়াস শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি নিজের বাড়িতেই একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অভাব থাকিলেও কনফিউসিয়াস ছাত্রদের নিকট বেশি মাহিনা চাহিতেন না। প্রাচীন ভারতের গুরুর ন্যায় তিনি উহাদের অনেককে নিজের বাড়িতে রাখিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ দিতেন। তিনি সাধারণতঃ মুখে মুখে পড়াইতেন। তাঁহার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রগণকে দেশের প্রাচীন জীবনের সহিত পরিচিত করিতে, তাহাদের মন উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ করিতে, সৌন্দর্যের প্রতি তাহাদিগকে অনুরাগী করিতে এবং অপরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার স্নিগ্ধ ও মধুর করিতে। কথিত আছে, কনফিউসিয়াস দেখিতে মোটেই সুন্দর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর, তাঁহার গুণও ছিল প্রচুর। তাই তিনি অনেক লোকের প্রিয় হইয়া উঠেন। এক সময় তিনি একটি নগরের শাসনকর্তা হন। এই সময় তিনি অনেকগুলি নূতন আইন প্রণয়ন করেন। নগরের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীরা কি ভাবে চলিবে, কি কাজ করিবে, এমন কি কি খাইবে ঐসব আইনে তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে তিনি শাসকের কাজ ছাড়িয়া দেন। ইহার পর তিনি বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার শেষ জীবন কিন্তু সুখের হয় নাই। কয়েকটি প্রিয় ছাত্রের মৃত্যুর ফলে তাঁহাকে বড়ই দুঃখ পাইতে হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের মত তিনি দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। ধীর ভাবে আপনার কর্তব্য সাধন করিয়া, ৭২ বৎসর বয়সে তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

কনফিউসিয়াসের সহিত বুদ্ধের কিছু কিছু মিল আছে। উভয়ই এক সময়ের লোক। উভয়ই দুঃখ হইতে তাঁহাদের দেশবাসীকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। উভয়ই বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা দুঃখ জয়ের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

যখন কনফিউসিয়াসের জন্ম হয় তখন চীনের বড় দুর্দিন। তখন দেশ অনেকগুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকিত। এই বিরোধের সুযোগ লইয়া উত্তর হইতে অসভ্যেরা আসিয়া লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিত।

স্বদেশীয়দের এই দুর্দশায় কনফিউসিয়াসের মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কিরূপে এই দুঃখের প্রতিকার হইতে পারে। শেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুঃখ জয় করিবার উপায় মানুষের হাতেই রহিয়াছে, দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে হইলে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন সমাজের মধ্যে থাকিয়া উহার কল্যাণ সাধন করা। তিনি বলিতেন, সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নিজ প্রদেশের প্রতি, নিজ নগরের প্রতি, এমন কি নিজ পরিবারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে ; সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভেচ্ছাসম্পন্ন হইতে হইবে ; ধর্মের প্রতি অনুরাগী হইতে হইবে ; জ্ঞানলাভ করিতে হইবে ; বিদ্বান্, বিনয়ী, সরল ও শিষ্টাচারী হইতে হইবে।

কনফিউসিয়াসের এই মতবাদ কনফিউসীয় ধর্ম নামে পরিচিত। চীনের অসংখ্য লোক এখনও এই ধর্ম অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহার প্রভাব বহু লোককে আদর্শ নাগরিক ও স্বদেশের অনুগত সেবক হইতে উৎসাহিত করিয়াছে।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ কনফিউসিয়াসের জন্ম
৪৭৮ কনফিউসিয়াসের মৃত্যু

আদর্শ প্রশ্নাবলী

কনফিউসিয়াস কে? কোন্ সময় এবং কোন্ দেশে তাঁহার জন্ম হয়? চীনের তখন কিরূপ অবস্থা ছিল? কনফিউসিয়াস কি ভাবে শিক্ষা দিতেন? কনফিউসীয় ধর্মের সারমর্ম বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

আলেকজাণ্ডার, পুরু ও চন্দ্রগুপ্ত

আলেকজাণ্ডার—আমরা পূর্বে বলিয়াছি, গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রায়ই বিরোধ হইত। এই বিরোধের ফলে উহারা দুর্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে একটি অখ্যাত রাষ্ট্র শক্তিশালী হইয়া উঠে। রাষ্ট্রটির নাম ম্যাসিডন। ম্যাসিডন গ্রীসের উত্তরে অবস্থিত। ইহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন রাজা ফিলিপ। তিনি একটি প্রবল সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন এবং ইহার সাহায্যে গ্রীস পর্যন্ত জয় করেন। ফিলিপের পুত্রের নাম আলেকজাণ্ডার। ফিলিপ আলেকজাণ্ডারকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এমন কি বিশ্ববিখ্যাত এরিষ্টটলকে পর্যন্ত তিনি পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

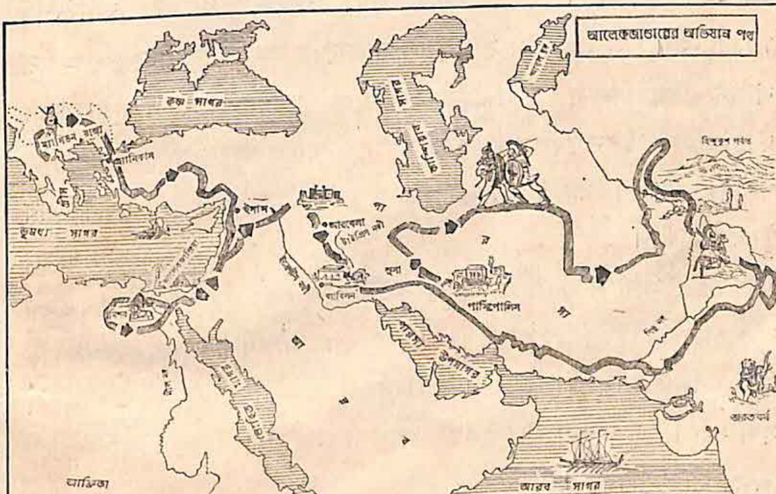


আলেকজাণ্ডার

প্রতিভায় আলেকজাণ্ডার ছিলেন গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। সেই প্রতিভা তাঁহার চেহারায়ও ফুটিয়া উঠিত। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—

"মহিমা মণ্ডিত প্রশান্ত ললাটে
অঙ্কিত প্রতিভা রেখা,
রাজ রাজেশ্বর বিধাতার লিপি
রহিয়াছে যেন লেখা"।

আলেকজাণ্ডারের জ্ঞান ছিল গভীর, কর্মশক্তি ছিল অদম্য, রণকৌশল ছিল অদ্বিতীয়, এবং শাসনক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। তাঁহার আশার অন্ত ছিল না। ইহাকে সফল করিবার তাঁহার সামর্থ্যেরও অভাব ছিল না। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু রণ জয়ই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সকল ব্যবধান দূর করিয়া একটি সুসভ্য মহারাষ্ট্র গড়িয়া তোলা।



আলেকজাণ্ডারের অভিযান পথ

একুশ বৎসর বয়সেই আলেকজাণ্ডার তাঁহার দিগ্‌বিজয় আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল পারসিক সাম্রাজ্য জয় করা। এই সময় ঐ সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আলেকজাণ্ডার এশিয়ার উপকূল ভাগ দিয়া

অগ্রসর হন এবং পারসিক সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি একের পর এক জয় করিয়া লন। মিশর, বেবিলন, টায়ার ও সিডন তাঁহার অধীন হয়। পারসিকদের রাজধানী পার্সেপলিসে আসিয়া তিনি দারায়ুসের প্রাসাদটি পোড়াইয়া দেন।

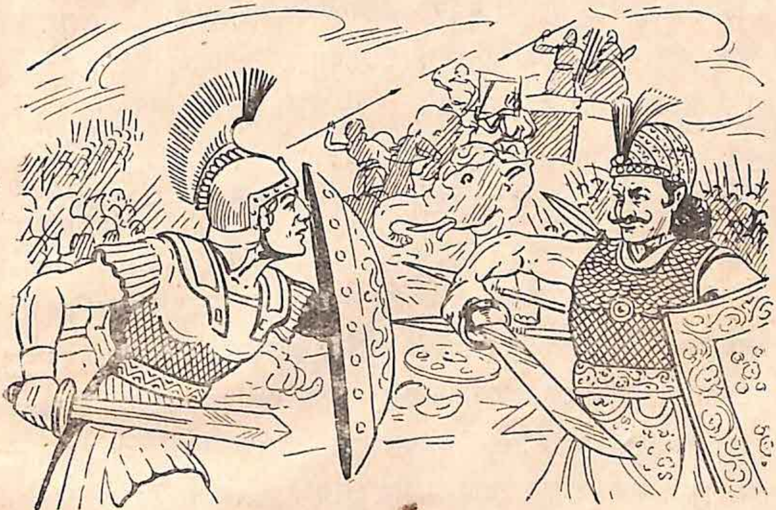
পারসিক সাম্রাজ্য জয় করিয়া আলেকজাণ্ডার আফ্‌গানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অভিযান চালান। ভারতবর্ষের এই অঞ্চল এক সময় পারসিক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ কালে সেখানে অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। অনেকগুলি রাষ্ট্র ছিল রাজাদের অধীন, আর কতকগুলির শাসন পরিচালনা করিত উহাদের অধিবাসীরা। কতকগুলি তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দিল। যে সকল রাষ্ট্র আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহাদের মধ্যে তক্ষশীলার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তক্ষশীলার শক্তি ছিল, সমৃদ্ধিও ছিল, কিন্তু ইহাকে বিশেষভাবে সুপরিচিত করিয়াছিল ইহার বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার চিকিৎসাবিদ্যালয়ের যশ ছিল সর্বাধিক। দূর দূরান্তর হইতে ছাত্ররা আসিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিত।

এই সময় তক্ষশীলার রাজা ছিলেন অম্ভি। তিনি কিন্তু বীরত্ব অথবা দেশপ্রীতির পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন, এমন কি সৈন্য দিয়াও স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করেন।

পুরু—সকলেই কিন্তু তক্ষশীলার রাজার ন্যায় স্বাধীনতা হারাইতে সম্মত হইলেন না। বিতস্তা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী রাজ্যের রাজা পুরু

তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে অনেকগুলি হাতি ছিল। ঐগুলি দেখিয়া গ্রীকেরা এতই ভয় পাইল যে, তাহারা কিছুতেই উহাদের সম্মুখীন হইতে সম্মত হইল না। তখন আলেকজাণ্ডার একটি কৌশলের আশ্রয় লইলেন। তিনি রাত্রির অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নদী পার হইলেন, এবং পুরুকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। আলেকজাণ্ডারের অজস্র



আলেকজাণ্ডার ও পুরুর যুদ্ধ

সৈন্যের বিরুদ্ধে পুরু বীরের মত যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইলেন। বন্দী হইয়াও তিনি আপনার সাহস ও মর্যাদা হারাইলেন না। আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কিরূপ ব্যবহার আশা কর?" পুরু সগর্বে উত্তর দিলেন—"রাজার প্রতি রাজা যেরূপ ব্যবহার করেন।" এই নির্ভীক উত্তরে মুগ্ধ হইয়া আলেকজাণ্ডার পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন, এমন কি উহার আয়তনও বাড়াইয়া দিলেন।

ইহার পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মগধ রাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার সৈন্যরা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সুতরাং ঐ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ফিরিবার পথে তাঁহাকে অনেক দুর্ধর্ষ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। সিন্ধুনদের মোহানার নিকট আসিয়া তিনি একদল সৈন্য জলপথে পারস্য উপসাগরের দিকে পাঠাইলেন, আর একদল লইয়া বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া তিনি স্থলপথে রওনা হইলেন এবং অনেক কষ্টে বেবিলনে পৌঁছিলেন। অল্পকাল পরে ঐ স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। বিজিত পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল লাভ করেন সেনাপতি সেলিউকস।

চন্দ্রগুপ্ত—আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় এক তরুণ যুবক তাঁহার শিবিরে আসেন। এই যুবকের নাম চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু কে এই চন্দ্রগুপ্ত? কেহ কেহ মনে করেন, চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দের পুত্র, তাঁহার মাতার নাম মুরা; আবার অনেকের মতে, তাঁহার জন্ম হইয়াছিল মৌর্য নামে এক প্রাচীন রাজবংশে।

চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আসিয়াছিলেন যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার উদ্দেশ্যে। যে কোন কারণেই হউক আলেকজাণ্ডার তাঁহার উপর বিরক্ত হন এবং তাঁহাকে বধ করিবার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্তকে কিন্তু বধ করা সম্ভব হইল না; বিদ্যুৎবেগে তিনি ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন।

চন্দ্রগুপ্ত গিয়া উপস্থিত হইলেন বিন্ধ্য অরণ্যে। সেখানে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। তারপর চাণক্য নামে তক্ষশীলার

এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তিনি মগধ জয় করিলেন। মগধ জয় করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। গ্রীকদের হাত হইতে তিনি পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ কাড়িয়া লইলেন এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত করিলেন।

সেলিউকস পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি ঐ দুইটি দেশ জয় করিতে পারেন নাই, এমন কি তাঁহার নিজের রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামে একজন দূতকেও চন্দ্রগুপ্তের সভায় পাঠান। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের একটি বিবরণ রচনা করেন। এই বিবরণের কয়েকটি অংশ মাত্র পাওয়া যায়। তবুও ইহাদের সাহায্যে সে সময়ের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর নাম ছিল পাটলিপুত্র। বিহার প্রদেশ পাটনার নিকট কুমরাহার নামে একটি গ্রামে ইহার ধ্বংসাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। নগরটি ছিল নয় মাইল লম্বা ও প্রায় দুই মাইল চওড়া। ইহার চারিদিকে ছিল উঁচু কাঠের প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে ছিল একটি ছয়শত ফুট চওড়া পরিখা। পাটলিপুত্রের শাসন-ভার ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সভার উপর ন্যস্ত ছিল।

রাজপ্রাসাদ ছিল প্রধানতঃ কাঠের তৈয়ারি। ইহার স্তম্ভগুলি সোনার পাতে মোড়া। স্তম্ভের গায়ে ছিল সোনার লতা, আর লতার মধ্যে রূপার পাখি। রাজসভায় আড়ম্বরের অন্ত ছিল না। সম্রাট সোনার শিবিকায় অথবা সুসজ্জিত হাতিতে চড়িয়া বাহিরে যাইতেন। তাঁহার পরিধানে থাকিত অতি সূক্ষ্ম মসলিন। এশিয়ার সর্বদেশের বিলাসদ্রব্য তিনি ইচ্ছা করিলেই ব্যবহার করিতে পারিতেন।

চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু বিলাসের মধ্যেই মগ্ন থাকিতেন না। দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রকাণ্ড স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখিতেন। এই বাহিনীতে বহু পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও রণহস্তী ছিল। নৌসৈন্যেরও অভাব ছিল না। সৈন্যগণ সরকার হইতে বেতন পাইত। তাহাদিগকে কঠোর শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইত। সৈন্যদের দেখাশুনা করিবার জন্যও ত্রিশ জন সদস্য লইয়া আর একটি সভা ছিল।

সম্রাট্ শাসনকার্যে বিশেষ অংশ লইতেন। তবুও তিনি সমস্ত সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখিতেন না। দূরবর্তী প্রদেশগুলির শাসন পরিচালনা করিতেন কয়েকজন রাজপ্রতিনিধি। ইঁহারা কিন্তু খুশিমত চলিতে পারিতেন না। সম্রাট ইঁহাদের উপর কড়া নজর রাখিতেন।

সংস্কৃত ভাষায় **'অর্থশাস্ত্র'** নামে একখানা রাজনীতির বই আছে। কেহ কেহ মনে করেন, ঐ বইখানা রচনা করিয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য। অনেকের ধারণা ইহার মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানিতে পারি, তাহা হইতে একথা জোর করিয়াই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি এই দেশকে বিদেশীয়দের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া এবং ইহার বহু অংশকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁহার সুশাসনের ফলে এই সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি অক্লান্তভাবে প্রজারঞ্জন করেন এবং আদর্শ ভারতীয় নরপতিদের ন্যায় শেষ জীবনে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন গ্রহণ করেন।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ৩৫৮ ফিলিপের সিংহাসন আরোহণ
" ৩৫৫ আলেকজাণ্ডারের জন্ম
" ৩৩৬ আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন আরোহণ
" ৩৩৪ আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ
" ৩৩১ পারস্য সাম্রাজ্যের পতন
" ৩২৭-৩২৫ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান
" ৩২৩ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু
" ৩২৪ হইতে ৩১৮ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
আঃ ৩০৫ খৃঃ পূঃ সেলিউকসের ভারত অভিযান

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ম্যাসিডন কোথায়? কি অবস্থায় ম্যাসিডন শক্তিশালী হইয়া উঠে।

২। আলেকজাণ্ডারের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল কি?

৩। আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও?

৪। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা কিরূপ ছিল?

৫। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে তক্ষশীলা কি কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল?

৬। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে বিতস্তা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তীস্থানে কে রাজত্ব করিতেন? আলেকজাণ্ডারের সহিত তিনি কিরূপ আচরণ করেন?

৭। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন? তিনি কেন ফিরিয়া যান?

৮। চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান জয় করেন?

৯। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকসের কি কারণে বিরোধ হয়? এই বিরোধের কি ফল হয়?

১০। মেগাস্থিনিস্ কে? কেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন? মেগাস্থিনিসের বিবরণ বর্ণনা কর।

১১। অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন? ইহার মধ্যে কোন্ যুদ্ধের ছবি পাওয়া যায়?

একাদশ অধ্যায়

অশোক

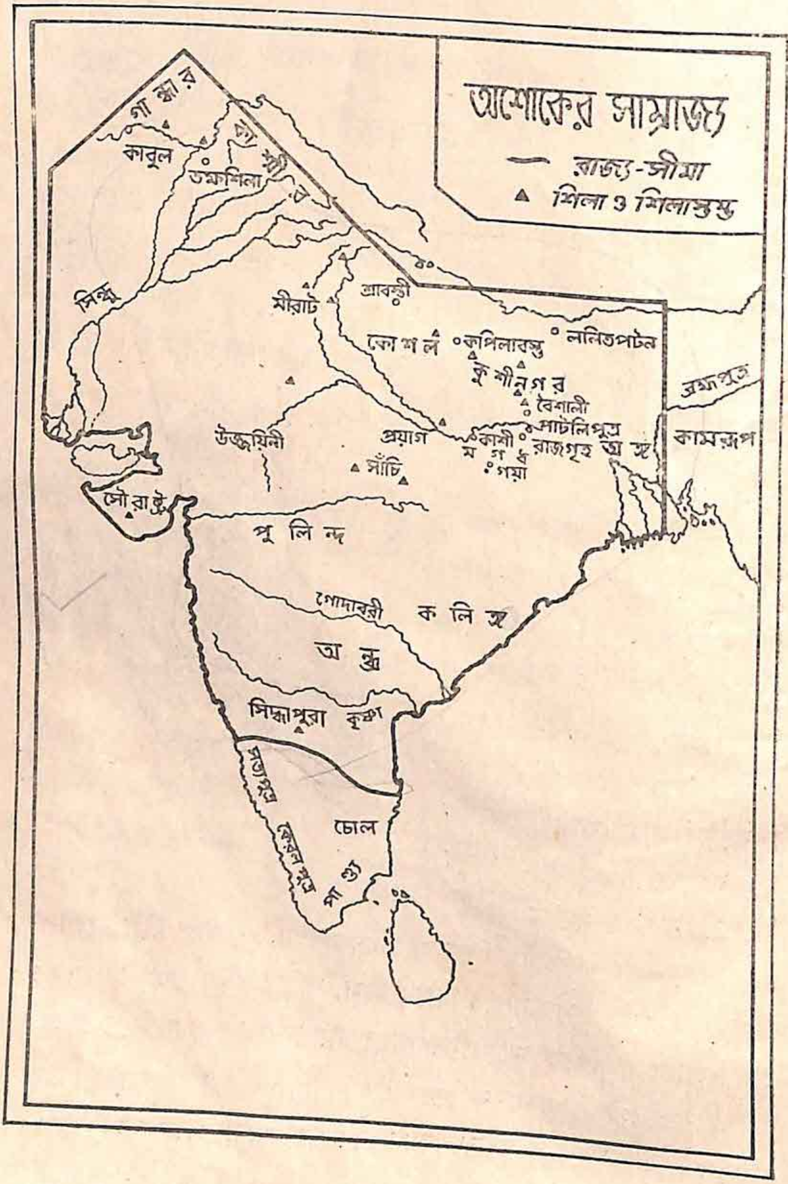
চন্দ্রগুপ্তের কথা বলিয়াছি। এইবার তাঁহার পৌত্র অশোকের কথা বলিতেছি। অশোক ছিলেন মৌর্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি তাঁহার বংশকে পবিত্র করেন, জন্মভূমিকে কৃতার্থ করেন।

অশোক কিন্তু যুদ্ধ করিয়া এই কীর্তির অধিকারী হন নাই। তাঁহার অনুপম জীবনের আদর্শই ইহার মূল। তবে কি অশোক যুদ্ধ করেন নাই? করিয়াছিলেন বৈকি! কথিত আছে, পিতা বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে, ভাইদের সহিত সিংহাসন লইয়া তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অশোকের জয় হয়। সিংহাসন লাভ করিয়া অনেক বৎসর অশোক পূর্বপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করেন। এই আদর্শের প্রেরণায় তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। কলিঙ্গ ছিল বঙ্গোপসাগরের তীরে। ইহার সমৃদ্ধি ছিল বিপুল, শক্তিও ছিল সুপ্রচুর। তবুও ইহার অধিবাসীদিগকে অশোকের বাহুবলের নিকট হার মানিতে হইল।



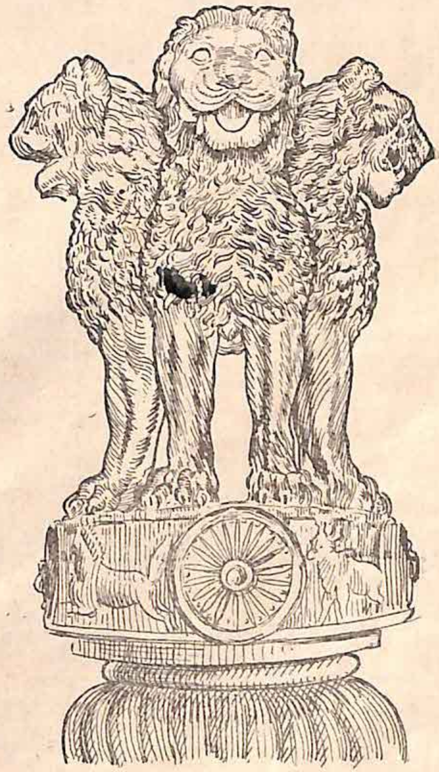
অশোক

জয়ের গৌরব বহন করিয়া মৌর্যবাহিনী পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু অশোক ফিরিলেন লজ্জা আর অনুতাপের গ্লানি লইয়া।


অশোকের সাম্রাজ্য
রাজ্য-সীমা
শিলা ও শিলাস্তম্ভ
গান্ধার
কাবুল
তক্ষশিলা
কাশ্মীর
সিন্ধু
মীরাট
শ্রাবস্তী
কোশল
কপিলাবস্তু
ললিতপাটন
কুশীনগর
বৈশালী
পাটলিপুত্র
কাশী
মগধ
রাজগৃহ
গয়া
অঙ্গ
ব্রহ্মপুত্র
কামরূপ
উজ্জয়িনী
প্রয়াগ
সাঁচি
সৌরাষ্ট্র
পুলিন্দ
গোদাবরী
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
সিদ্ধাপুরা
কৃষ্ণা
সত্যপুত্র
কেরলপুত্র
চোল
পাণ্ড্য

তিনি নিজের চোখে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত হয়, দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়। যুদ্ধের ফলেও অগণিত লোক প্রাণ হারায়; বহু সাধুসজ্জন মৃত্যু অথবা নির্বাসন বরণ করিতে বাধ্য হন; বহু সুখী পরিবার বন্ধু অথবা আত্মীয় হারান; বহু সমৃদ্ধ জনপদ শ্রীহান হয়।

এই সব কথা অশোক কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। শেষে তিনি শপথ করিলেন,—জীবনে আর যুদ্ধ করিবেন না; কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় করিলে, তিনি ঐ অন্যায় সহ্য করিবেন। তাঁহার তরবারি আর কোষমুক্ত হইবে না; তাঁহার সাম্রাজ্যে রণভেরী আর বাজিবে না। এই সময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে আসেন। ইহার মৈত্রী ও করুণার আদর্শে তিনি নূতন জীবনের সন্ধান পান। তিনি সংকল্প করেন,—এখন হইতে এই আদর্শ প্রচার করাই হইবে তাঁহার জীবনের পরম লক্ষ্য।



অশোকস্তম্ভ

বহুলোক বুদ্ধের আদর্শ কি জানিত না। তাই অশোক তাঁহার অনেকগুলি উপদেশ পাহাড় ও স্তম্ভের গায়ে ক্ষোদিত করিয়া দেন। এই সব উপদেশের মধ্যে ধর্মের কোন গভীর কথা নাই, আছে চরিত্র ভাল করিবার নির্দেশ।

ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল—সত্য কথা বলা, পিতামাতাকে ভক্তি করা, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, অপর ধর্মের লোকদিগকে অসম্মান না করা, কাহারও প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ না করা এবং সকল প্রাণীর প্রতি স্নেহশীল হওয়া। বুদ্ধের উপদেশ ক্ষোদিত করিয়াই অশোক ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে লোকেরা এইসব উপদেশ মানিয়া চলে, সে বিষয়েও তিনি যত্নশীল ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'ধর্ম-মহাপাত্র' নামে এক শ্রেণীর রাজপুরুষ নিযুক্ত করেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অশোক নিজেও অংশ গ্রহণ করেন। পূর্বের রাজারা বাহির হইতেন শিকার করিতে, অথবা উৎসব করিতে। অশোক শিকার ছাড়িয়া দেন। প্রমোদ উৎসবেও তিনি যোগ দিতেন না। দেশের নানাস্থানে গিয়া তিনি সকলকে নীতি ও ধর্মের কথা শুনাইতেন।

সাম্রাজ্যের বাহিরেও অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। তামিল ভাষাভাষী লোকেরা ঐ সব রাজ্যে বাস করিত। অশোক ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলবাসিগণকে ঐ ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রবাদ আছে, অশোকের প্রচারকগণ ব্রহ্মদেশেও গিয়াছিলেন। তাঁহার দূতগণ পশ্চিম এশিয়া, মিশর, ম্যাসিডোনিয়া এবং গ্রীসে মৈত্রী ও করুণার পতাকা বহন করিয়া লইয়া যান।

এতদিন ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতবর্ষের কয়েকটি অংশে প্রচলিত ছিল। অশোকের প্রচারের ফলে এই ধর্ম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—

"উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর।"

বৌদ্ধধর্মের এই প্রভাবের গৌরব অনেক অংশে অশোকেরই প্রাপ্য।

বুদ্ধের আদর্শ প্রচার করিয়াই অশোক তৃপ্ত হন নাই, এই আদর্শকে তিনি তাঁহার শাসনে এবং জীবনে সফল করিয়া তুলিতে প্রাণপণ যত্ন করেন।

তিনি তাঁহার প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সকল সময় এবং সকল অবস্থায় তিনি তাহাদের দুঃখ দূর করিতে যত্ন করিতেন। যাহাতে তাহাদের উপর কোন উৎপীড়ন না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার কড়া নজর ছিল। তিনি সকল রাজপুরুষকে কর্তব্যশীল হইতে নির্দেশ দিতেন। এই নির্দেশ পালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের দূরতম অংশে বিশ্বাসী কর্মচারী পাঠাইতেন।

অশোকের পূর্বে অপরাধীগণকে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। অনেক সময় তাহাদের হাত-পা পর্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। অশোক আইনের এই কঠোরতা কমাইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার শাসনকালে ধনী ও দরিদ্রের একইভাবে বিচার হইত। তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই বহু কয়েদীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন।

অশোক প্রজাদের দুঃখ দূর করিতে প্রাণপণ যত্ন করেন। দরিদ্রকে তিনি অন্নদান করেন, পথিকগণের উপকারের জন্য তিনি

পথের পার্শ্বে বৃক্ষরোপন ও কূপ খনন করেন। পীড়িতের চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালের ব্যবস্থা করেন। পশুদের জন্যও তিনি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যের বাহিরেও তিনি মানুষ ও পশুর জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়। অশোকের স্মৃতি কিন্তু কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। সকল লোককে শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরিচালিত করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। যখন তিনি এই ব্রত গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার ঐশ্বর্যের অবধি ছিল না; তখনও তাঁহার জয়শ্রী বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। তিনি আজীবন তাঁহার মহৎ ব্রত পালন করেন। পৃথিবীর আর কোনও নরপতি এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ অশোকের সিংহাসন আরোহণ

২৩২ অশোকের মৃত্যু

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অশোক কেন কলিঙ্গ জয় করেন? এই জয়ের ফল কি হয়?

২। অশোক মৈত্রী ও করুণার আদর্শকে কিভাবে তাঁহার শাসনে ও জীবনে সফল করিতে চেষ্টা করেন?

৩। অশোক যে ধর্ম প্রচার করেন তাহার মূল কথা কি?

৪। অশোক কিভাবে প্রজাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন?

৫। অন্যান্য রাজাদের সহিত অশোকের প্রভেদ কোথায়?

৬। অশোকের প্রভাব কি কারণে কালজয়ী হইয়াছে?

দ্বাদশ অধ্যায়

রোম ও হ্যানিবল

রোমের অভ্যুত্থান—

ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনা হইয়াছিল প্রথমে গ্রীসে, তারপর রোমে। গ্রীসের কথা বলা হইয়াছে, এখন রোমের কথা বলিতেছি।

ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে তোমরা দেখিতে পাইবে গ্রীসের পশ্চিমে একটি সাগর। সাগরটির পশ্চিমে একটি উপদ্বীপ। উপদ্বীপটির নাম ইটালী। রোম ইটালীর একটি নগর। যেখানে টাইবার নদী গিয়া সাগরে মিশিয়াছে, সেখান হইতে প্রায় পনের মাইলের মত দূরে রোম অবস্থিত। নিকটে নদী থাকায় রোমের অধিবাসীরা সহজেই বাণিজ্য করিতে পারিত। যাহারা প্রথমে রোমে বাস করিত, বাণিজ্যই ছিল তাহাদের প্রথম এবং প্রধান বৃত্তি।

কে রোম নির্মাণ করিয়াছিল সে কথা ঠিক করিয়া বলা যায় না; তবে এবিষয়ে একটি পুরাতন কাহিনী আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে বলিতেছি।

ইটালীতে অ্যালবালঙ্গা নামে একটি রাজ্য ছিল। নিউমিটার ঐ রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। নিউমিটারের পুত্র সন্তান ছিল না, ছিল মাত্র একটি মেয়ে। এই মেয়েটির দুইটি ছেলে, নাম—রোমিউলাস ও রিমাস।

নিউমিটারের একজন ছোট ভাই ছিল। এই ভাইটি মোটেই ভাল লোক ছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল দাদার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসন লাভ করিবেন। তিনি জানিতেন রোমিউলাস ও রিমাস বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে না। তাই একদিন

তিনি তাহাদের মাকে মারিয়া ফেলিলেন, আর তাহাদিগকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। তারপর তিনি তাঁহার দাদাকে তাড়াইয়া দিয়া রাজা হইয়া বসিলেন।

ছেলে দুইটি কিন্তু ডুবিয়া মরিল না। ভাসিতে ভাসিতে তাহারা এক ঝোপের কাছে গিয়া পৌঁছিল। ঐ সময় একটা বাঘিনী জল খাইতে আসিয়াছিল। ছেলে দুইটি তাহার চোখে পড়িয়া গেল। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, বাঘিনী নিশ্চয়ই তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। বাঘিনী কিন্তু সেরূপ করিল না, বরং নিজের গুহায় লইয়া গিয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করিতে লাগিল।



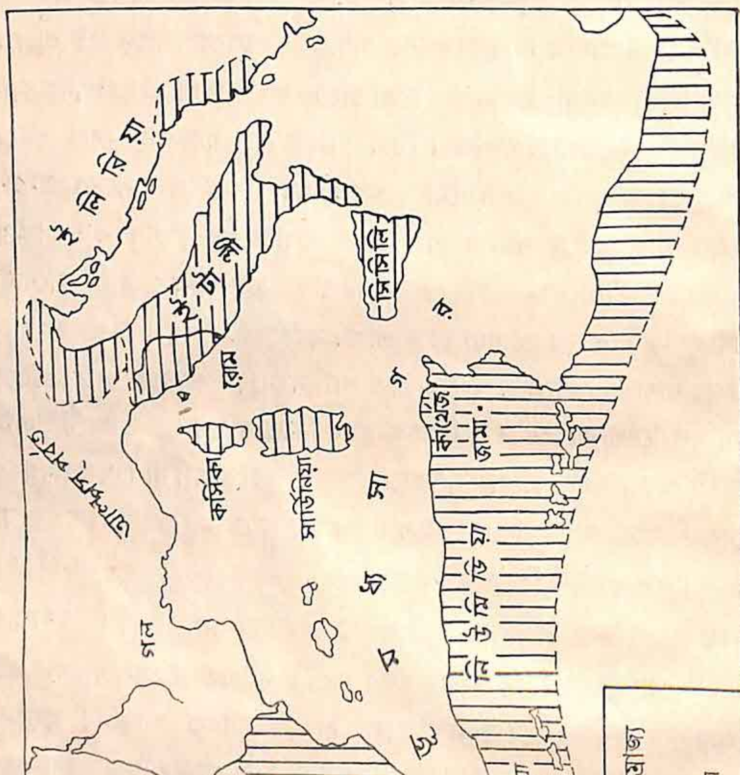
বাঘিনীর আশ্রয়ে
রোমিউলাস ও রিমাস

কিছুদিন পরে এক পশুপালক তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। লোকটির ছেলেমেয়ে কিছুই ছিল না। তাই সে আদর করিয়া তাহাদিগকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার ঘরে দুই ভাই বড় হইয়া উঠিল। বড় হইয়া তাহারা সকল ঘটনা জানিতে পারিল। তখন তাহারা গিয়া নিউমিটারকে এ্যালবালঙ্গার সিংহাসনে বসাইল। তাহারা কিন্তু এ্যালবালঙ্গায় রহিল না, দূরে গিয়া একটি নূতন নগর নির্মাণ করিল। রোমিউলাসের নাম অনুযায়ী এই নগরের নাম হইল রোম।

কাহিনীটি কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না। আমরা এই মাত্র জানি রোম প্রথমে ছিল রাজাদের অধীনে। শেষের দিকে এই রাজারা অত্যাচারী হইয়া উঠেন। অত্যাচারে ফল পাইতেও তাঁহাদের দেরি হইল না। প্রজারা ক্ষেপিয়া গিয়া রাজবংশের সকলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজশাসনের শেষ হইলেই কিন্তু জনশাসনের প্রতিষ্ঠা হইল না। দেশে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরাই তখন কর্তা হইয়া বসিল। তাহাদের একটি সভা ছিল। এই সভার নাম সেনেট। সেনেটের সাহায্যে তাহারা রোম শাসন করিতে লাগিল। এই অবস্থায় কিন্তু সাধারণ লোকেরা খুসী হইতে পারিল না! তাহারা দাবি করিতে লাগিল, দেশ-শাসনে তাহাদিগকে ভাগ দিতে হইবে। তাহাদের দাবি এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে ইহাকে অমান্য করা চলিল না। তাহাদিগকে দেশ-শাসনে অংশ দিতে হইল। এইরূপে রোম একটি গণতন্ত্র বা জনশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল!

ইটালীর বিভিন্ন স্থানে অনেক উপজাতির বাস ছিল। ইহাদের সহিত রোমের বিরোধ আরম্ভ হয়। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া এই বিরোধ চলে। শেষে যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময় ইটালীর প্রায় সব জায়গাতেই রোমের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়।

রোম নির্মিত হইবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ফিনিসীয় বণিকগণ আফ্রিকার উত্তর উপকূলে একটি বন্দর নির্মাণ করে। ইহার নাম কার্থেজ। কার্থেজ ধীরে ধীরে একটি মহানগর হইয়া উঠে। এই নগরের অধিবাসীরা বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করে। তাহাদের অনেকগুলি রণতরীও ছিল। ভূমধ্যসাগরের অনেক দ্বীপও তাহাদের অধীন হয়। ফলে রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। উভয় রাষ্ট্রই ছিল শক্তিশালী, উভয়ই ছিল পরস্পরের প্রতিবেশী


রোমক ও কার্থেজীয় সাম্রাজ্য
কার্থেজীয় সাম্রাজ্য
রোমকদের অধিকৃত অঞ্চল
সিসিলি
সার্ডিনিয়া
কর্সিকা
রোম
কার্থেজ
ভূ ম ধ্য সা গ র
নি উ মি ডি য়া
ম রে টে নি য়া
স্পে ন
গল
ই লি রি য়া

তাহাদের মধ্যে মাত্র ভূমধ্যসাগরের ব্যবধান। ইটালীর নিকটে সিসিলি দ্বীপ। এই দ্বীপের অনেক অংশেও কার্থেজের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া উঠে; ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ হয়।

প্রথম যুদ্ধে কার্থেজ ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং তাহার কয়েকটি দ্বীপ রোমের হাতে চলিয়া যায়। ঐ যুদ্ধ শেষ হইবার প্রায় তেইশ বৎসর পরে কার্থেজ ও রোমের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের মূল হ্যামিলকার।

হ্যামিলকার ছিলেন কার্থেজের একজন প্রধান নাগরিক ও বিশিষ্ট সেনানায়ক। স্বদেশের পরাজয় দেখিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ তিনি অবশ্যই লইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্পেনদেশের অনেক অংশ জয় করেন এবং তাঁহার পুত্র হ্যানিবলকে কাছে রাখিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। কথিত আছে, যখন হ্যানিবলের বয়স খুব অল্প, সেই সময় হ্যামিলকার তাহাকে লইয়া মন্দিরে যান। সেখানে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তিনি চিরকাল রোমের শত্রু থাকিবেন।

হ্যানিবল ও রোম—

বড় হইয়া হ্যানিবল পিতার অপেক্ষাও রণনিপুণ হইয়া উঠেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের মতই পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

পিতার মৃত্যুর পর হ্যানিবল তাঁহার সৈন্যগণকে আরও শক্তিশালী করিয়া তোলেন। তারপর তিনি ইহাদের লইয়া ফ্রান্সের মধ্য দিয়া এবং দুর্গম আল্পস্ পর্বতমালা পার হইয়া ইটালী আক্রমণ করেন।

হ্যানিবল পনর বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। একটি যুদ্ধেও তাঁহার পরাজয় হয় নাই। কিন্তু অন্য সব জায়গায় কার্থেজের পরাজয় হইতে থাকে। রোমক সেনাপতি সিপিও স্পেন জয় করিয়া আফ্রিকা আক্রমণ করেন। তখন কার্থেজের লোকেরা ভয় পাইয়া হ্যানিবলকে ইটালী হইতে ডাকিয়া পাঠায়। আফ্রিকার জামা নামক স্থানে সিপিওর সহিত হ্যানিবলের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হয়।



হ্যানিবল

ঐ পরাজয়ের ফলে কার্থেজের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়। কার্থেজ রোমের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ইহার কিছুকাল পরে হ্যানিবলকে কার্থেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়।

হ্যানিবল কিন্তু ইহাতে নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি এশিয়ায় গিয়া রোমের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আয়োজন সফল হইল না। শেষে তিনি এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ

করেন। কিন্তু ঐ রাজা রোমকদের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করেন। হ্যানিবল এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে শত্রুর হাতে পড়িতে হইবে বুঝিয়া তিনি বিষপান করিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। এইরূপে পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ দেশভক্ত বীরের জীবনাবসান হইল।

হ্যানিবলের মৃত্যুতেও কার্থেজ রেহাই পাইল না। রোমকদের মনে ভয় লাগিয়াই রহিল, কবে ঐ রাষ্ট্রটি আবার প্রবল হইয়া উঠিবে। তাহাদের এই ভয় আরও বাড়াইয়া তুলিলেন কেটো। কেটো ছিলেন রোমের একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'কার্থেজকে ধ্বংস করিতেই হইবে'। রোমকেরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহারা কার্থেজ আক্রমণ করিল। কার্থেজের অধিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। তবুও তাহারা দুই বৎসর ধরিয়া রোমকদিগকে ঠেকাইয়া রাখিল, শেষে তাহারা আর পারিল না। রোমকরা কার্থেজের প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া উহাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল।

কার্থেজের পতনের ফলে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলের প্রায় সকল স্থানে রোমকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িবার পথ তাহাদের নিকট খুলিয়া গেল।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৮০০ কার্থেজের প্রতিষ্ঠা

৭৫৩ রোমের প্রতিষ্ঠা

২৬৪ রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ

২৪১ প্রথম যুদ্ধের অবসান

খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ২১৮ রোম ও কার্থেজের মধ্যে দ্বিতীয় যুদ্ধ

২০২ জামার যুদ্ধ

১৪৯ রোম ও কার্থেজের মধ্যে তৃতীয় যুদ্ধ

১৪৬ কার্থেজের ধ্বংস

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। রোম নগর নির্মাণের প্রাচীন কাহিনীটি বর্ণনা কর।

২। রোম প্রথমে কাহাদের শাসনাধীন ছিল? কিরূপে ঐ শাসনের অবসান হয়?

৩। কিরূপে রোম একটি জনশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল?

৪। কিরূপে ইটালীর প্রায় সর্বত্র রোমের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়?

৫। রোম ও কার্থেজের মধ্যে কি কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়? ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে।

৬। রোম ও কার্থেজের প্রতিদ্বান্দ্বতার কি ফল হইল?

৭। হ্যামিলকার কে? তিনি কি কারণে স্মরণীয় হইয়াছেন?

৮। হ্যানিবলকে পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ দেশভক্ত বলিবার কারণ কি?

৯। হ্যানিবল রোমের বিরুদ্ধে কি কারণে যুদ্ধ করেন? ঐ যুদ্ধের কি ফল হয়?

১০। কি অবস্থায় হ্যানিবলের মৃত্যু হয়?

১১। কার্থেজের পতনের ফলে রোমের কি উপকার হয়?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সম্রাটদের যুগে রোমকদের জীবনযাত্রা

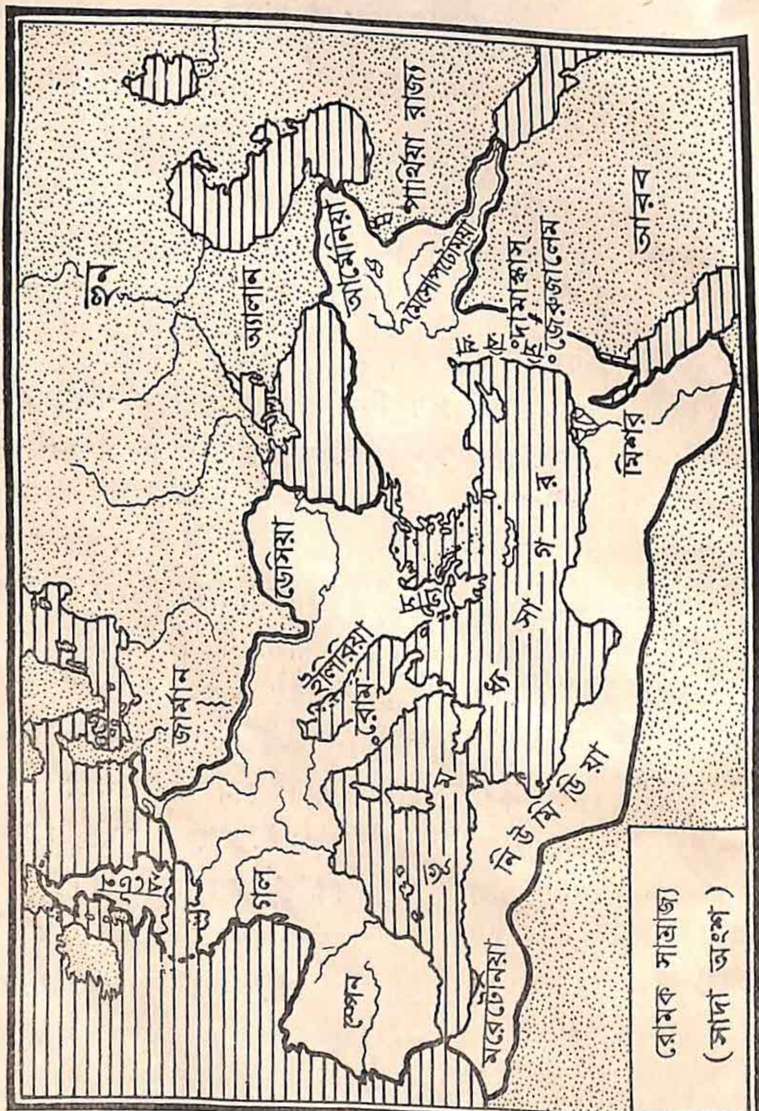
পূর্বের অধ্যায়ে বলিয়াছি কার্থেজের সহিত যুদ্ধের ফলে রোম বিশাল একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হইবার সুযোগ লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই এই সাম্রাজ্য ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক অংশে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, মিশর এবং আরও অনেক দেশ রোমের অধীন হয়।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে কিন্তু রোমের পুরাতন শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রায়ই এক একজন নেতা প্রবল হইয়া খুশিমত শাসন কার্য চালাইতে থাকেন। ইহাদিগকে বলা হইত এক-নায়ক। এই সব এক-নায়কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন জুলিয়াস্ সিজার। কিন্তু তিনি বেশিদিন কর্তৃত্ব করিতে পারেন নাই। শত্রুর হাতে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর অক্টেভিয়ান সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। অক্টেভিয়ানের সময় হইতে রোমে সম্রাট্দের যুগ আরম্ভ হয়।



জুলিয়াস্ সিজার

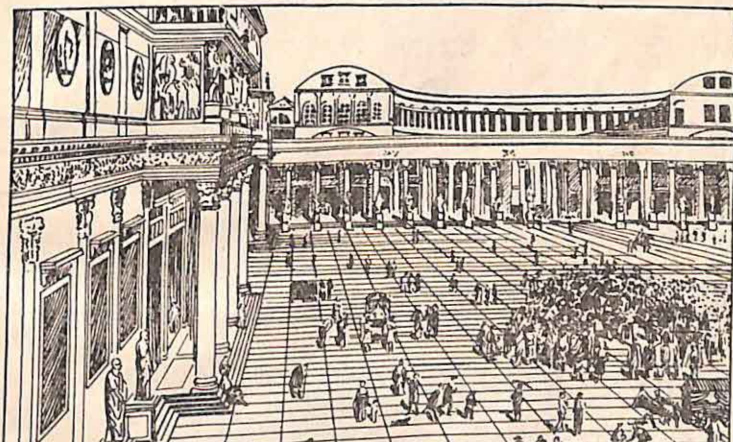
সম্রাটেরা ছিলেন বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। সম্রাট মারকাস অরেলিয়াস সৎ চিন্তা করিতেন এবং সৎভাবে রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেন। সম্রাট ক্যালিগুলা ছিলেন বিপরীত প্রকৃতির। তাঁহার নির্মমতা ছিল ভয়ঙ্কর। সম্রাট নিরো তো নির্মম


রোমক সাম্রাজ্য
(সাদা অংশ)
পার্থিয়া রাজ্য
আর্মেনিয়া
মেসোপটেমিয়া
দামাস্কাস
জেরুজালেম
আরব
মিশর
আলান
হুন
জার্মান
ডেসিয়া
ইলিরিয়া
রোম
গল
স্পেন
মরেতেনিয়া
নিউমিডিয়া
ভূ ম ধ্য সা গ র
ব্রিটেন

ছিলেনই, তার উপর তিনি ছিলেন খেয়ালী। একবার রোমে আগুন লাগে, নিরো আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা করেন না, বরং আগুন দেখিয়া তাঁহার এত কৌতুক বোধ হয় যে, তিনি আনন্দে বীণা বাজাইতে আরম্ভ করেন।

সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর নগর ছিল। কিন্তু রোমের সহিত ইহাদের কাহারও তুলনা হইত না। ইহার ভাণ্ডার ভরা থাকিত বিভিন্ন দেশ হইতে আনীত রাশি রাশি বহুমূল্য দ্রব্যে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল সোনা, সূক্ষ্মবস্ত্র, খাদ্যশস্য, পশুর চামড়া ও জলপাইয়ের তেল প্রভৃতি।

রোমে শোভা পাইত অগণিত স্তম্ভ, তোরণ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড



রোমের ফোরাম

ইমারত। রোমের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্যে স্থানের নাম ফোরাম্। ইহার চারিদিকে ছিল সুন্দর সুন্দর দেব-মন্দির ও বিচারালয়। যে

সকল বিষয়ে সাধারণের স্বার্থ জড়িত, সেই সব বিষয়েরও আলোচনা এই ফোরামেই করা হইত। রোমের প্রধান রঙ্গালয়ের নাম কলসিয়াম। এই স্থানে খেলাধূলা হইত, নাট্যাভিনয়ও হইত। কলসিয়ামের আকার ছিল অর্ধচন্দ্রের ন্যায়, ইহার আয়তন ছিল এত বিশাল যে পঞ্চাশ হাজার লোক ইহার মধ্যে বসিতে পারিত।

রোমে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করিত। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে রাজপুরুষ, সৈনিক ও ক্রীতদাস। রাজপুরুষ ও সৈনিকদের ধন, মান, কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু ক্রীতদাসদের জীবন ছিল দুঃখে পরিপূর্ণ। তাহাদের স্বাধীনতা ছিল না। বিনা বেতনে তাহাদিগকে সারাদিন কাজ করিতে হইত। তাহারা জমি চাষ করিত, কিন্তু শস্যের অংশ দাবি করিতে পারিত না। অর্ধাহারে এমন কি অনাহারে তাহাদের দিন কাটিত। অসহ্য দুর্ব্যবহার তাহাদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হইত। অথচ ইহাদের কাজ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইহারা জমি চাষ করিত, পথঘাট নির্মাণ করিত, বাড়ি-ঘর তৈয়ারি করিত, জলাশয় প্রভৃতি খনন করিত। ইহাদের অনেকে শিক্ষকের কাজও করিত।

দেশের কিন্তু ধনীরও অভাব ছিল না। সার্কাস দেখিয়া, হিংস্র পশু ও মানুষের মধ্যে লড়াই দেখিয়া এবং বন্য জন্তু শিকার করিয়া স্বচ্ছন্দে ইহাদের সময় কাটিয়া যাইত।


সার্কাসের অভ্যন্তর

রোমের অধিবাসীরা কিন্তু খেলাধূলা লইয়াই থাকিত না। অনেক ভাল কাজও তাহারা

করিত। তাহাদের নিকট ইউরোপ অনেক বিষয়ে ঋণী। তাহারা সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তিরক্ষা করিত। বড় বড় রাজপথ, দুর্গ, পুল, নর্দমা, জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ করিত। তাহারা রোগ নিবারণ করিতে যত্নশীল ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা বহু হাসপাতাল নির্মাণ করে। তাহাদের আইনের উপর ভিত্তি করিয়া বহু ইউরোপীয় রাষ্ট্রের আইনকানুন হইয়াছে।

রোমকেরা একটি সুন্দর ও শক্তিশালী সাহিত্যেরও সৃষ্টি করে। তাহাদের প্রধান কবির নাম হইল ভার্জিল। ভার্জিলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনার নাম 'ইনীড'। 'ইনীড' একখানি মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের নায়ক হইলেন ইনীয়াস। ইনীয়াস ছিলেন ট্রয়ের একজন রাজকুমার। গ্রীকেরা ট্রয় পোড়াইয়া দিলে, তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া ঐ নগর হইতে চলিয়া যান। বহু দেশ ঘুরিয়া এবং বহু দুঃখ সহ্য করিয়া তিনি ইটালীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনীডে তাঁহাকেই রোমকদের পূর্বপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে রোম নগরের নির্মাণ, উহার শক্তির প্রসার ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

রোমকদের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিকেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন লিভি ও ট্যাসিটাস। লিভি রোমের প্রথম দিকের আর ট্যাসিটাস উহার শেষ দিকের ইতিহাস রচনা করেন।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে রোমকেরা রাজ্য বিস্তারে, শিল্প সাধনায়, জন সেবায়, আইন প্রণয়নে ও সাহিত্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। তাহারা বাণিজ্যেরও প্রসার

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ৫৯-৪৪ জুলিয়াস্ সীজারের শাসনকাল

২৭ অক্টেভিয়ানের অগাষ্টাস্ উপাধি লাভ ও রোমে সম্রাটদের যুগ আরম্ভ।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কিরূপে রোম একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়? ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রধান প্রধান দেশগুলির নাম কর।

২। রোমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ায় উহার শাসনব্যবস্থার কেন পরিবর্তন হয়?

৩। জুলিয়াস সিজার কে? কিভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়? তাঁহার মৃত্যুর কি ফল হয়?

৪। রোমে সম্রাটদের যুগ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হয়? রোমক সম্রাটগণ কি প্রকৃতির লোক ছিলেন?

৫। সম্রাটদের যুগে রোমের অবস্থা কিরূপ ছিল? সম্রাটদের যুগে রোমের অধিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। রোমের ধনী অধিবাসীদের কিরূপে সময় কাটিত?

৭। রোমের অধিবাসীদের নিকট ইউরোপ কোন্ কোন্ বিষয়ে ঋণী?

৮। রোম ও ভারতের মধ্যে যে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতে বৈদেশিক শাসন

আমরা বলিয়াছি অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরে মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতি বিদেশ হইতে এদেশে আসে।

গ্রীক শাসন—

গ্রীকেরা আসে হিন্দুকুশ পাহাড় ও অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী বাহ্লীক (বর্তমান বালখ) হইতে। ইহারা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের কতক অংশে প্রভুত্ব বিস্তার করে। এক সময় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত ইহারা অগ্রসর হয়।


মিলিন্দ

গ্রীক রাজারা অনেক সুন্দর সুন্দর মুদ্রা প্রবর্তন করেন ; এই সব মুদ্রা হইতে আমরা তাহাদের অনেক কথা জানিতে পারি।

এই গ্রীকদের মধ্যে মিনাণ্ডার নামে এক পরাক্রান্ত রাজার আবির্ভাব হয়। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল শাকল (বর্তমান শিয়ালকোট)। ইনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন।

মিলিন্দপঙহো নামে একখানা গ্রন্থ আছে। এই বইখানা লিখিত কথোপকথনের আকারে। কথোপকথন হয় বৌদ্ধ সাধু নাগসেন ও

মিলিন্দের মধ্যে। অনেকের মতে এই মিলিন্দই মিনাণ্ডার। মিলিন্দের অভ্যাস ছিল কূটপ্রশ্ন করিয়া অপরকে অপ্রস্তুত করা। কিন্তু সাধু নাগসেনকে ঐরূপ করিতে গিয়া তাঁহাকেই হার মানিতে হয়। নাগসেনের উত্তর শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হন যে তিনি শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ভারতে গ্রীকদের শক্তি স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে একতা ছিলনা, ছিল দলাদলি আর কলহ। ফলে ইহাদের প্রভুত্ব ক্রমেই দুর্বল হইয়া, শেষে একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শক শাসন—

শকেরা প্রথমে মধ্য-এশিয়ায় বাস করিত। সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা অক্ষুনদীর (শীরদরিয়ার) তীরে বসতি স্থাপন করে। সেখান হইতেও তাড়া খাইয়া তাহারা ভারতে প্রবেশ করে এবং পঞ্জাবের কতক অংশে, যমুনা নদীর তীরে, উজ্জয়িনীতে এবং মহারাষ্ট্র দেশে কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে। কালক্রমে এই সব রাজ্যও ভাঙ্গিয়া যায়।

পহ্লবেরা আসে পার্থিয়া হইতে। পারস্য দেশের অন্তর্গত খোরাসান ও কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরকে পার্থিয়া বলা হইত। পহ্লবেরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধুদেশে তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে।

পহ্লব রাজাদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় হইতেছেন গণ্ডোফারনিস। প্রবাদ আছে যীশুখৃষ্টের শিষ্য সাধু টমাস্ ইঁহাদের রাজ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি গণ্ডোফারনিসের জন্য একটি প্রাসাদ তৈয়ারি করিতে সম্মত হন। গণ্ডোফারনিস্ খুসী হইয়া প্রয়োজনীয়

অর্থ দেন। টমাস কিন্তু ঐ অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। রাজা একথা জানিতে পারিয়া টমাসকে ডাকিয়া পাঠান এবং প্রাসাদ কেন তৈয়ারি হয় নাই তাহা জানিতে চাহেন। উত্তরে টমাস জানান, স্বর্গে তাঁহার প্রাসাদ তৈয়ারি হইতেছে। সাধুর কথা শুনিয়া গণ্ডোফারনিস্ অত্যন্ত রাগিয়া যান এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অনেকে এই কাহিনীটি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে।

শক ও পহ্লবদের পরে কুষাণেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইহারা মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি, সম্ভবতঃ তুর্কী জাতির আত্মীয়।

কুষাণেরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং উত্তর ভারতের অনেক অংশ অধিকার করে। তাহাদের প্রধান নরপতির নাম কণিষ্ক।

কণিষ্ক ছিলেন একজন দিগ্‌বিজয়ী বীর। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কুষাণদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। চীন দেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি চীনা-তুর্কীস্থান পর্যন্ত অধিকার করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুরে (পেশোয়ার)। তক্ষশীলা ও মথুরা প্রভৃতি নগরীও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।



কণিষ্কের মুদ্রা

দেশ জয় করিয়াই কণিষ্ক ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে শিল্প ও সংস্কৃতির আধার করিয়া তোলেন।

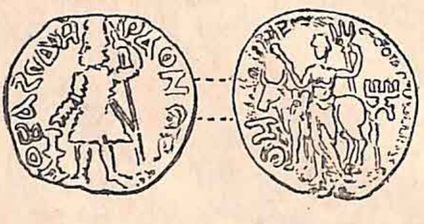
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি—
উন্মাদ কলরবে

ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত,
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর
আমারি শোণিতে র'য়েছে ধ্বনিত
তারি বিচিত্র সুর।"

মহাকবির এই কথা যে কত সত্য তাহা শক, পহ্লব ও কুষাণদের ইতিহাস পড়িলেই বুঝা যায়। এই সব বিদেশী জাতি এদেশে বাস করিয়া ইহার আচার-ব্যবহার এমন কি ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

কণিষ্কের একজন বংশধরের নাম বাসুদেব। কুষাণদের অনেকে যে ভারতীয় প্রভাবের অধীন হইয়াছিল এই নামে আমরা তাহার আভাষ পাই। কুষাণ যুগে ভারতীয় সভ্যতার বহুমুখী উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল। দার্শনিক নাগার্জুন, কবি অশ্ব ঘোষ, ভিষকশ্রেষ্ঠ চরক এই যুগেরই লোক।



বাসুদেবের মুদ্রা

কণিষ্ক নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইহার উন্নতিতে সহায়তা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে একটি বৌদ্ধসভার অধিবেশন হয়। তিনি পুরুষপুরে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর একটি পরম সুন্দর চৈত্য বা মঠ নির্মাণ করেন।

কুষাণ যুগে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বহু উপকরণ আমাদের সভ্যতার মধ্যে স্থান লাভ করে। এই যুগের বৌদ্ধমূর্তিতে আমরা গ্রীক দেবমূর্তির এবং মুদ্রায় রোমক মুদ্রার প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি

এই সময় বৌদ্ধ ধর্মেরও বিশেষ পরিবর্তন হয়। অশোকের যুগে বৌদ্ধগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভগবান বুদ্ধের সরল উপদেশ অনুসারে তাহাদের জীবন সুন্দর ও পবিত্র করিয়া তোলা। দেবদেবীর পূজা-পার্বন প্রভৃতির কথা তাহারা ভাবিত না। কিন্তু পরে বুদ্ধ দেবতা বলিয়া পূজিত হইতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ বিদেশীয় বৌদ্ধগণ বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ ও পূজা করিতেন। এই মূর্তিপূজা ভারতীয় বৌদ্ধগণ গ্রহণ করেন। এমন কি ইহাকে তাঁহারা ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করেন। এই পরিবর্তিত ধর্মের নাম হয় 'মহাযান' বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্ম চীন, জাপান ও অন্যান্য অনেক দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ১৮৭ হইতে ১৫০ এর মধ্যে পাঞ্জাবে গ্রীক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
" প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে শক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
খ্রীষ্টাব্দ ৫০ গণ্ডোফারনিসের রাজত্বকাল
" ৭৮ কণিষ্কের সিংহাসনারোহণ

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অশোকের মৃত্যুর পর গ্রীকেরা কোন্ দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে? কতদূর পর্যন্ত তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়? কি কারণে ঐ প্রভুত্বের অবসান হয়?

২। মিনাণ্ডার কে? কেন তিনি স্মরণীয় হইয়াছন?

৩। শক াহারা? কোথা হইতে এবং কোন্ সময়ে তাহারা ভারতবর্ষে আসে? কত্ পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়?

৪। সাধু টমাস কে ? কোন্ সময় এবং কি কারণে তিনি ভারতবর্ষে আসেন ?

৫। সাধু টমাসের সহিত গণ্ডোফারনিসের কেন বিরোধ হয় ?

৬। কুষাণ কাহারা ? কোন্ সময় তাহারা ভারতবর্ষে আসে ? কতদূর পর্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় ?

৭। কণিষ্ক কে ? কি কারণে তিনি স্মরণীয় হইয়াছেন ?

৮। কি ভাবে কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতিতে সহায়তা করেন।

৯। কুষাণ যুগে বৌদ্ধ ধর্মের কি পরিবর্তন হয় ?

১০। মহাযান বৌদ্ধধর্ম কাহাকে বলে ? কি ভাবে ঐ ধর্মের উদ্ভব হয় ?

১১। কুষাণ যুগে বহু গ্রীক ও রোমক উপকরণ ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করে—এই কথা প্রমাণ কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টধর্মের প্রসার

পূর্বের অধ্যায়ে খৃষ্টধর্মের উল্লেখ করিয়াছি। এইবার ঐ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার কথা বলিতেছি। এই মহাপুরুষের নাম যীশুখৃষ্ট। তিনি ছিলেন জাতিতে ইহুদী ; রোমক সম্রাট অগাষ্টাসের রাজত্বকালে জুডা প্রদেশের (পশ্চিম প্যালেষ্টাইনের) বেথলেহেম গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। যীশুর মাতার নাম মেরী। মেরীর বিবাহ হয় একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে। এই মিস্ত্রীর নাম জোসেফ।

যীশুর জন্মদিনে জোসেফ ও মেরী বেথলেহেমে গিয়াছিলেন। কোন বাড়িতে স্থান না পাইয়া শেষে তাঁহারা এক অশ্বশালায় আশ্রয় লন। সেই অশ্বশালায়ই যীশুর জন্ম হয়। কথিত আছে পূর্ব দেশের কয়েকজন জ্ঞানী সেখানে আসিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

যীশুর নিয়মিত ভাবে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অতি শৈশব হইতেই তাঁহার মনে ধর্মভাব প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় জুডায় জন নামে এক সাধুপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি নির্জন প্রান্তরে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন এবং সকলকে নিষ্পাপ হইয়া ভগবানের করুণার যোগ্য হইতে উপদেশ দিতেন।

ইহুদীদের নিয়ম ছিল প্রত্যেককে ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। জর্ডান নদীতে স্নান করাইয়া, অথবা উহার জল মাথায় ছিটাইয়া দীক্ষা দেওয়া হইত। যীশু জনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। যীশুকে দীক্ষা দিবার অল্পকাল পরেই জনকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হয়। যীশুর জন্মের অনেক পূর্বেই জুডা রোমকদের অধীন হইয়াছিল। সেখানে হেরড নামে রোমকদের একজন আশ্রিত রাজা ছিলেন। হেরড



যীশুর ধর্মপ্রচার

ভাল লোক ছিল না। জন তাহাকে তাহার পাপের জন্য তিরস্কার করেন। ইহাতে হেরড রাগিয়া গিয়া এই মহাপুরুষকে হত্যা করে।

জনের মৃত্যু হইল, কিন্তু তাঁহার কাজ পড়িয়া রহিল না। যীশু নিজের হাতে সেই কাজ তুলিয়া লইলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া সকলকে ধর্মশীল হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। যীশু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি এই সব উপদেশ নিজের জীবনে সত্য করিয়া তুলিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তির তুলনা ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁহার প্রেমও ছিল এই ভক্তির মতই গভীর। তিনি রোগীর রোগ দূর করিতেন, অন্ধকে চক্ষু ফিরাইয়া দিতেন। প্রবাদ আছে, তাঁহার আহ্বানে মৃতদেহে

প্রাণ ফিরিয়া আসিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বহু লোক যীশুর অনুরাগী হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া বার জন লোক সর্বত্যাগী হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। ইহারা 'দ্বাদশ শিষ্য' নামে খ্যাত।

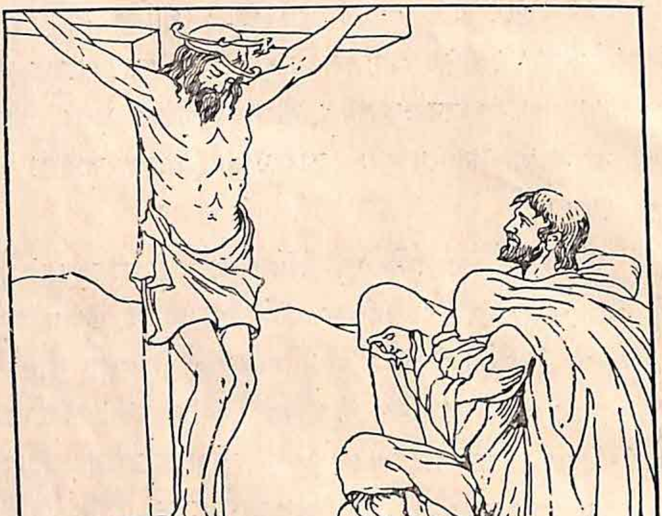
যীশুর প্রভাবে কিন্তু সকলে সুখী হইতে পারিল না। যাহারা অপরকে ঠকাইয়া বড় হয়, ইহুদীদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের অভাব ছিল না। তাহাদের মনে ভয় হইল, যীশুর প্রচারের ফলে তাহাদের পাপের ব্যবসা আর চলিবে না। তাই তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল।

যীশু আপনাকে ভগবানের পুত্র বলিয়া প্রচার করিতেন। তিনি আরও বলিতেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া আনাই তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার শত্রুরা এই কথা বিকৃত করিয়া রোমক শাসনকর্তার কান ভারী করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যীশু রাজা হইবার দুরাশা করিতেছেন, সুতরাং তিনি রোমক সরকারের শত্রু। তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করাইল।

বিচারের সময় যীশু স্পষ্ট করিয়া জানাইলেন, তিনি পৃথিবীর কোন রাজ্য চান না। মানুষের মনের মধ্যে তিনি স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চান। ইহাতেও কিন্তু তাঁহার অব্যাহতি হইল না। আদেশ হইল, তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিতে হইবে।

সৈন্যগণ যীশুকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে অনেক অপমান করিল, বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার মাথায় কাঁটার মুকুট পর্যন্ত পরাইয়া দিল। যীশু নীরবে সকল অপমান সহ্য করিলেন। একখানা কাঠের উপরে পেরেক মারিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করা হইল। তবুও তিনি অবিচল রহিলেন। ক্রুশ বিদ্ধ হইয়াও তিনি ভগবানের নিকট মিনতি জানাইলেন, "পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না কি করিতেছে।"

এইরূপে শত্রুরা অতি নির্মমভাবে যীশুকে নিহত করিল, কিন্তু তবুও তাহাদের আশা সফল হইল না। যাশু পৃথিবী হইতে চলিয়া



ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট

গেলেন, কিন্তু তিনি রাখিয়া গেলেন তাঁহার মৃত্যু-বিজয়িনী বাণী, আর

রাখিয়া গেলেন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ঐ বাণী সার্থক করিবার উপযোগী শক্তি ও শ্রদ্ধা। যীশুর শিক্ষার মূল কথা হইল ভক্তি ও প্রেম। তিনি প্রচার করিতেন—"সকল মন ও প্রাণ দিয়া ভগবানকে ভালবাসিবে, ভগবানকে পিতা বলিয়া এবং সকল লোককে ভাই বলিয়া মনে করিবে, সকলকে বিপদে সাহায্য করিবে, জীবন সর্বতোভাবে পবিত্র রাখিবে, ধন সঞ্চয় কবিবে না, দরিদ্রের মধ্যে ঐ ধন বিলাইয়া দিবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়া, অন্নহীনকে অন্ন দিয়া, পাপীকে ক্ষমা করিয়া, সকলকে ভালবাসিয়া ভগবানের করুণার যোগ্য হইবে, কেহ অন্যায় করিলে তাহার প্রতি ফিরিয়া অন্যায় করিবে না, কেহ তোমাকে তাগার সহিত এক মাইল যাইতে বলিলে খুশি মনে তাহার সহিত দুই মাইল যাইবে, ভগবানকে আরাধনা করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখিবে তোমার কাহারও সহিত বিরোধ আছে কিনা, থাকিলে ঐ বিরোধ মিটাইয়া পরে আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, প্রতিটি কর্মে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তুলিতে যত্নশীল হইবে।"

যীশুর শিষ্যেরা বিশ্বাস করেন যীশু ভগবানের পুত্র। তিনি পাপময় পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে ত্রাণ করিতে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন, যীশুর মৃত্যু হয় নাই, তিনি সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন, আবার তিনি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন এবং স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ রাজ্যের অধিপতি হইবেন। তাই তাঁহারা তাঁহাকে বলেন ক্রাইষ্ট বা খৃষ্ট। ক্রাইষ্ট কথাটির অর্থ হইল অভিষিক্ত নরপতি। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া যীশুর শিষ্যেরা তাঁহার বাণী দেশেবিদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথমে কেহ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিল না। কেহ হাসিল, কেহ বা তাঁহাদের অপমান করিল। কিন্তু পরে অনেকেই এই নূতন ধর্মের প্রতি অনুরাগী

হইল। তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া অনেকের নিরাশ মন আশায় সবল হইয়া উঠিল, দুঃখীর ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনায় ভরিয়া গেল, পাপী ধর্মের পথে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে রোমক সাম্রাজ্যের বহু অংশে খৃষ্টানদের প্রভাব বাড়িতে লাগিল। এই প্রভাব দেখিয়া কিন্তু রোমক সরকারের ভয় হইল ; ফলে খৃষ্টানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। খৃষ্টানগণ এই অত্যাচারে ভীত হইলেন না। তাঁহারা হাসিমুখে দুঃখ বরণ করিয়া আরও লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শেষে খৃষ্টধর্ম এত শক্তিশালী হইয়া উঠিল যে সম্রাট্ কনস্ট্যান্টাইন পর্যন্ত এই ধর্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর হইতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের পথে আর কোন অন্তরায় রহিল না।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীঃ পূঃ ৪ যীশুখ্রীষ্টের জন্ম

খৃষ্টাব্দ ৩৩ যীশুখ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ

" ৩১৩ কনস্ট্যানটাইন কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি প্রদান।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কোন্ স্থানে এবং কি অবস্থায় যীশুর জন্ম হয় ?

২। যীশুকে কে দীক্ষিত করেন? তিনি কি করিতেন? কি ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয় ?

৩। যীশুর উপদেশের মূল কথা কি? কি ভাবে যীশু তাঁহার উপদেশ নিজের জীবনে সত্য করিয়া তোলেন ?

৪। কি কারণে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়? ক্রুশবিদ্ধ হইয়া যীশু কি করেন?

৫। যীশুকে কেন 'ক্রাইষ্ট' বলা হয়?

৬। কি অবস্থার ফলে খৃষ্টধর্ম রোমক সাম্রাজ্যে প্রভাবশীল হইয়া উঠে এবং কিভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের অন্তরায় দূর হয়?

ষোড়শ অধ্যায়

গুপ্তসম্রাটদের সুবর্ণ যুগ

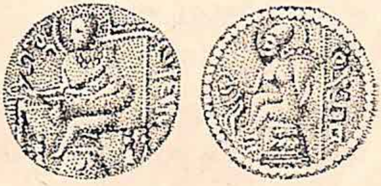
আমরা বলিয়াছি অনেকদিন ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে কতকগুলি বিদেশী জাতি রাজত্ব করে। তাহার পর ভারতীয়গণ আবার স্বাধীন হইয়া একটি নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হইলেন মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেন তাঁহার দিগ্‌বিজয় ও চরিত্র লইয়া একটি প্রশস্তি রচনা করেন। এলাহাবাদে একটি স্তম্ভে এই প্রশস্তিটি ক্ষোদিত আছে।

এই প্রশস্তি হইতে আমরা জানিতে পারি, সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের বহু রাজ্য জয় করেন। তিনি তাঁহার বিজয় বাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্যের সুদূর কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হন। উত্তর ভারতের বিজিত রাজ্যগুলি তিনি নিজ শাসনাধীনে আনেন, কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যের নরপতিগণকে রাজ্য শাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই, তাঁহাদিগকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন মাত্র।

তাঁহার এই বিজয়ের ফলে, তাঁহার প্রভুত্ব হিমালয় হইতে নর্মদা ও ব্রহ্মপুত্র হইতে যমুনা ও চম্বল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আসাম, পূর্ববঙ্গ, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতনা ও মালব তাঁহার সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধীন না হইলেও তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে। এই সময় কাবুলে কুষাণ বংশের এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনিও সমুদ্রগুপ্তকে ভয় করিতেন।

প্রাচীন যুগে পরাক্রমশালী রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার সার্বভৌম অধিকার প্রমাণ করেন। তাঁহার মুদ্রা হইতেও আমরা এই যজ্ঞের কথা জানিতে পারি।

সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি রাজ্য জয় করিতে পারিতেন, আবার উহাকে সুন্দরভাবে শাসনও করিতে পারিতেন। হরিসেন তাঁহাকে সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতকুশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি মুদ্রায় দেখা যায় তিনি বীণা বাজাইতেছেন। সুতরাং তিনি গানবাজনা ভালবাসিতেন, এ বিষয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

তিনি সাহিত্যিকগণকেও সমাদর করিতেন। তাঁহার সভাকবি হরিসেনই ইহার প্রমাণ। সমুদ্রগুপ্তের একটি উপাধি ছিল 'কবিরাজ'। এই উপাধি হইতে মনে হয় তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন।

গুপ্তবংশের আর একজন প্রধান নরপতির নাম ছিল **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত**। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় বহু গল্পে আমরা বিক্রমাদিত্য রাজার কথা শুনিতে পাই। তাঁহাকে একাধারে বীরত্ব দানশীলতা ও গুণগ্রাহিতার আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। তাঁহার সভায় নয়জন সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে বলা হইত **নবরত্ন**। কালিদাস ছিলেন ইঁহাদের অন্যতম। অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই এই বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরও উজ্জয়িনীতে একটি রাজধানী ছিল। তাঁহার সভায়ও বহু পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ কালিদাসও ঐ সভা অলঙ্কৃত করিতেন।

ফা-হিয়েন ও তাঁহার বিবরণ—

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীন দেশ হইতে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার নাম ফা-হিয়েন। তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা ঐ সময়ের অনেক কথা জানিতে পারি। আমরা জানিতে পারি যে দেশে সুশাসন ছিল, শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল, সদাচার ও সংযম ছিল ; দেশে দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল ; যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল। পুলিশের অত্যাচার ছিল না। কঠোর শাস্তি ছিল না ; তবুও চোরডাকাতের ভয় ছিল না। জলপথে সিংহল, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতির সহিত বাণিজ্যের সুযোগ ছিল। এই সুযোগ গৃহীতও হইত।

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তখনও নিষ্প্রভ হয় নাই। দেশে বহু বৌদ্ধ তীর্থ ছিল। বুদ্ধমূর্তি লইয়া মহা আড়ম্বরে শোভাযাত্রা বাহির হইত। পাটলিপুত্রে দুইটি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ছিল। দুইটিতেই বহু মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। দূর-দূরান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিত। সিন্ধু নদের তীর হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্যন্ত অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল। একমাত্র মথুরাতেই কুড়িটি বিহার ছিল। এই সব বিহারে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন।

দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকিলেও হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল আরও অনেক বেশি। গুপ্ত সম্রাটদের অনেকেই ছিলেন একনিষ্ঠ হিন্দু। এই সময় বহু দেবতার পূজা হইত। লোকে শুধু অভ্যাস বশেই দেবপূজা করিত না, তাহারা সকল মন ও প্রাণ দিয়া পূজা করিত ; তাহাদের অনুসৃত আদর্শের নাম 'ভক্তিবাদ'।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। উভয় ধর্মের লোকেরা পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিত।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভা অলঙ্কৃত করিতেন একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি কয়েকখানি অতি সুন্দর কাব্য ও নাটক রচনা করেন। তাঁহার লিখিত রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষগণের এবং বংশধরদের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার আর একখানা কাব্যের নাম কুমারসম্ভব (কার্তিকের জন্মকথা)। কথিত আছে, পার্বতী তপস্যা করিয়া শিবকে পতিরূপে লাভ করেন। তাঁহাদের বিবাহের ফলে দেব সেনাপতি কুমার বা কার্তিকের জন্ম হয়। এই কাহিনী লইয়া কুমারসম্ভব রচিত। আমাদের দেশের আর একটি কাহিনী অবলম্বনে কালিদাস তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক শকুন্তলা রচনা করেন। এই কাহিনীর মূল কথা হইল রাজা দুষ্মন্তের সহিত মহামুনি কণ্বের পালিত কন্যা শকুন্তলার বিবাহ। এই বিবাহের ফলে সম্রাট ভরতের জন্ম হয়। ইঁহার নামানুসারেই নাকি এই দেশের নাম হইয়াছে ভারতবর্ষ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। গুপ্তযুগে শূদ্রক ও বিশাখ দত্ত নামে দুইজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। বিশাখ দত্তের নাটকের নাম মুদ্রারাক্ষস। এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে কিরূপে চাণক্য তাঁহার কূট বুদ্ধিবলে পরাজিত নন্দরাজের মন্ত্রী রাক্ষসের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন নির্বিঘ্ন করিয়া তোলেন।

আমাদের দেশের স্মৃতি নামে এক শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ আছে। আমরা কি ভাবে জীবনের পথে চলিব, স্মৃতিতে সে বিষয় বহু উপদেশ আছে।

অনেকগুলি স্মৃতি গুপ্তযুগে রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের সবটা এক সময় রচিত হয় নাই। উহাদের মধ্যে বহু যুগের রচনা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে এই রচনার সমাপ্তি হয়। অনেকগুলি পুরাণও এই যুগে রচিত হয়।

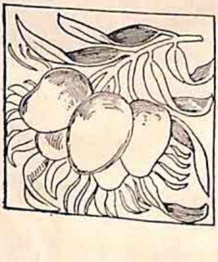
গুপ্তযুগে চিত্র বিদ্যারও অসামান্য উন্নতি সাধিত হয়। অজন্তা গুহার দেওয়ালের চিত্রগুলি ইহার প্রমাণ।



অজন্তার একটি গুহা

এই গুহাগুলি হায়দারাবাদ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসের জন্য পাহাড় কাটিয়া এগুলি নির্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, কতকগুলি ব্যবহৃত হইত উপাসনার জন্য, আবার কতকগুলি ছিল ভিক্ষুদের বাস-গৃহ। গুহাগুলির দেওয়ালে অনেকগুলি অতি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব চিত্রে বুদ্ধদেবের জীবনী ও আরও অনেক বিষয় অঙ্কিত রহিয়াছে। চিত্রগুলি প্রাচীন ভারতবাসীর অনুপম শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন।





অজন্তার ছবি

গুপ্তযুগে হিন্দু দেবদেবীর অনেকগুলি অতি সুন্দর মূর্তিও নির্মিত হয়। বুদ্ধদেবেরও কয়েকটি চমৎকার মূর্তি এই যুগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

এই সময় বিজ্ঞান চর্চারও বিশেষ উন্নতি হয়। ভারতীয়েরা গ্রীকদের নিকট হইতে গ্রহতারার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানকে তাহারা আপনাদের সাধনার বলে আরও উজ্জ্বল করিয়া তোলে। তাহারা চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি করে। তাহারা পশু বধ করিয়া উহাদের দেহের গঠন প্রণালী শিখিত। ঐ জ্ঞানের সাহায্যে তাহারা মানুষের দেহের গঠন অনুমান করিত। তাহারা মোম দিয়া মূর্তি গড়িত। ঐ সকল মূর্তির উপরে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহারা মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার করিতে শিখিত। তাহাদের এই জ্ঞানের প্রভাব আমরা আরবীয় ও গ্রীকদের চিকিৎসা বিদ্যায় লক্ষ্য করিতে পারি।

অতএব আমরা দেখিতে পাই গুপ্তসম্রাটদের যুগে ভারতীয়েরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহারা অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক একতা ফিরিয়া পাইয়াছিল। গুপ্তসম্রাটগণের শাসন গুণে তাহারা শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধির অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, অলসতাও ছিল না। ধর্মে, জ্ঞানে ও কর্মে তাহারা ব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ধর্মভাব ছিল আন্তরিক ও উদার। তাহাদের জ্ঞান ছিল গভীর। তাহাদের কর্মশক্তি ছিল সুপ্রচুর। বীর্যবলে তাহারা বিদেশীয়গণকে পরাজিত করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত স্বাধীন করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয়গণকে তাহারা ঘৃণা করিত না। গ্রীকদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, স্থাপত্যে ও চিত্র শিল্প প্রভৃতিতে তাহারা অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই তাহাদের কর্মশক্তি নিবদ্ধ ছিল না। চীন, সিংহল, পারস্য এমনকি সুদূর রোমের সহিতও তাহাদের

সংযোগ ছিল। এই সব কারণে গুপ্ত যুগকে ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণ যুগ বলা যায়।

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ ৩২০ গুপ্ত সাম্রাজ্যর প্রতিষ্ঠা
" আঃ ৩৫০ সমুদ্রগুপ্ত
" ৩৭৫-৪১৪ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
" ৪০৫-১১ ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বীজয় বর্ণনা কর।

২। সমুদ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের কোন্ কোন্‌স্থান পর্যন্ত আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করেন ?

৩। সমুদ্রগুপ্ত কিভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবা যোগ্যতা লাভ করেন ?

৪। সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা যে অসাধরণ ছিল তার প্রমাণ কি ?

৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কেন প্রাচীন ভরতীয় গল্পের বিক্রমাদিত্য বলা হয় ?

৬। ফা-হিয়েন কে ? কোন সময়ে তিনি ভারবর্ষে আসেন ?

৭। ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়া কি দেখিয়াছেলেন ?

৮। গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষিণ হয় নাই, এই কথা সপ্রমাণ কর।

৯। গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য প্রষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে ?

১০। যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের সাধারণ উন্নতি হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে ?

১১। যুগে বিজ্ঞানচর্চার উন্নতি হয়াছিল, এইরূপ ভাবিবার কারণ কি ?

১২। যুগকে কেন ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণ যুগ বলা হয় ?
